উ প ন্যা স

হিমু এবং হার্ভার্ড পিএইচডি বল্টুভাই

হুমায়ূন আহমেদ

হার্ভার্ডের পিএইচডি দেখেছিস ?—বলেই মাজেদা খালা চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে রইলেন। যেন তিনি কঠিন এক ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছেন, যার উত্তর তিনি ছাড়া কেউ জানে না। তাঁকে একই সঙ্গে আনন্দিত এবং উত্তেজিত মনে হচ্ছে। কপালে উত্তেজনার বিন্দু বিন্দু ঘাম। ঠোঁটের কোণে আনন্দের চাপা হাসি। খালা তাঁর গোল চোখ আমার দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে এনে গলা নামিয়ে বললেন, এই হাঁদারাম! হার্ভার্ডের ফিজিক্সের পিএইচডি দেখেছিস কখনো ?

আমি বললাম, না। দেখতে ভয়ঙ্কর ?

খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, ভয়ঙ্কর হবে কেন ? অন্যরকম।

অন্যরকমটা কী ?

সারা গা থেকে জ্ঞানের আভা বের হওয়ার মতো অন্যরকম।

বলো কী!

বড় বড় দিশেহারা চোখ। দেখলেই এমন মায়া লাগে।

আমি বললাম, চোখ দিশেহারা কেন ?

খালা বললেন, ফিজিক্সের জটিল সমুদ্রে পড়েছে, এইজন্যে দিশেহারা। এখন সে কাজ করছে 'ঈশ্বর কণা' নিয়ে। যতই সে পড়ছে ততই দিশেহারা হচ্ছে। আহা বেচারা! ঈশ্বর কণার নাম শুনেছিস কখনো ?

অলংকরণ : ধ্রুব এষ

না। ঈশ্বর যে কণা হিসেবে পাওয়া যায় তা-ই জানতাম না।

খালা বললেন, আমিও জানতাম না। বাংলাদেশে কেউ মনে হয় জানে না।

আমি বললাম, বাংলাদেশ বাদ দাও, ঈশ্বর নিজেও হয়তো জানেন না।

ঈশ্বর জানবেন না এটা কেমন কথা! উনি সবই জানেন।

হার্ভার্ড সাহেবকে চেনো কীভাবে?

সে তোর খালু সাহেবের বন্ধুর ছেলে।

পিএইচডি সাহেবের নাম কী?

ডক্টর আখলাকুর রহমান চৌধুরী। ভুল বলেছি চৌধুরী আগে হবে। ডক্টর চৌধুরী আখলাকুর রহমান। ফুল প্রফেসর অব থিওরেটিকেল ফিজিক্স। ভেনডারবেল্ট ইউনিভার্সিটি।

ডাকনাম কী?

ডাকনাম দিয়ে কী করবি?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, যারা জটিল অবস্থানে থাকে তাদের ডাকনাম খুব হাস্যকর হয়। দেখা যাবে উনার ডাকনাম বল্টু।

বল্টু?

হ্যাঁ বল্টু। পেরেকও হতে পারে। আবার গোল্লা ফোল্লাও হওয়া বিচিত্র না।

খালা বিরক্ত গলায় বললেন, যতই দিন যাচ্ছে তোর কথাবার্তা ততই অসহ্য হয়ে যাচ্ছে। চা-কফি কিছু খাবি?

খাব।

কী দেব, চা না কফি?

দুটাই দাও। এক চুমুক চা খেয়ে এক চুমুক কফি খাব। ডাবল অ্যাকশন। হার্ভার্ড পিএইচডির কথা শুনে ঝিম ধরে গেছে। ডাবল অ্যাকশন ছাড়া গতি নেই। ইউরোপ-আমেরিকা হলে বলতাম নিট দুই পেগ হুইস্কি দাও, অন দ্যা রক।

খালা বললেন, আমি যে তোর মুরুব্বি, গুরুজন, এটা মনে থাকে না? লাগামছাড়া কথাবার্তা।

খালা হয়তো আরও কিছু কঠিন কথা বলতেন, তার আগেই মোবাইল ফোন বাজল। তিনি ফোন নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলেন। মোবাইল ফোনের নিয়ম হচ্ছে—এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভালো লাগে না। হাঁটাহাঁটি করে কথা বলতে হয়।

মিনিট তিনেক পার করে খালা উদয় হলেন। এখন তাঁকে পদার্থবিদ সাহেবের মতো খানিকটা দিশেহারা দেখাচ্ছে। মুখের ভঙ্গি কাঁচুমাচু। আমি বললাম, খালা কোনো সমস্যা?

খালা নিচু গলায় বললেন, ও টেলিফোন করেছিল। ওর ডাকনাম সত্যিই বল্টু। ওরা দুই যমজ ভাই। একজনের নাম নাট, আরেকজনের নাম বল্টু। একসঙ্গে নাট-বল্টু। ওদের বাবা ছিল পাগলাটাইপের। এইজন্যে নাট-বল্টু নাম রেখেছে। কী বিশ্রী কাণ্ড!

তুমি মন খারাপ করছ কেন? বল্টু নাম তো খারাপ কিছু না। ডক্টর বল্টু—শুনতেও ভালো লাগছে। নাট-বল্টু দুই ভাইকে নিয়ে সুন্দর ছড়াও হয়—

নাট বল্টু দুই ভাই
রিকশা চড়ে, দেখতে পাই।
রিকশা যায় মতিঝিল
বল্টু হাসে খিলখিল।
নাটের মুখ বন্ধ
তার গায়ে গন্ধ।

খালা কঠিন গলায় বললেন, চুপ কর। মুখ বন্ধ।

আমি মুখ বন্ধ করলাম। খালা বললেন, বল্টু উঠেছে সোনারগাঁও হোটেলে। রুম নাম্বার চার শ' একুশ। তোকে খবর দিয়ে এনেছি বল্টুকে কিছু জিনিস দিয়ে আসবি।

আমি বললাম, সহজ নামের মাহাত্ম্য দেখলে? তুমি নিজেও এখন সমানে বল্টু ডাকছ। বল্টুভাইকে এখন আর দূরের কেউ মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে ঘরের মানুষ। সে এমন একজন যে দুই চান্সে 'ইন্টার' পাস করেছে। অনেক চেষ্টা করেও কোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারে নি। তার এখন প্রধান কাজ মেয়ে-স্কুলের গেটের সামনে হাঁটাহাঁটি করা। ফ্লাইং কিস দেওয়া।

তুই কি চুপ করবি? নাকি একটা থাপ্পড় দিয়ে মুখ বন্ধ করব?

চুপ করলাম।

খালা বললেন, ও লুঙ্গি-গামছা আর একটা বাংলা ডিকশনারি চেয়েছে। সব আনিয়ে রেখেছি। তুই দিয়ে আয়।

নো প্রবলেম। লুঙ্গি, বাংলা ডিকশনারি বুঝলাম। গামছা কেন? কাদের সিদ্দিকীর দলে জয়েন করার পরিকল্পনা কি আছে?

খালা হতাশ গলায় বললেন, এত কথা বলছিস কেন? তুই কিন্তু বল্টুর সঙ্গে কোনো ফাজলামিটাইপ কথা বলবি না। ও অতি সম্মানিত একজন মানুষ। প্রফেসর ইউনূসের মতো নোবেল প্রাইজও পেয়ে যেতে পারে।

তা হলে তো বিরাট সমস্যা।

কী সমস্যা?

নানান মামলা মোকদ্দমায় জড়াতে হবে। বাংলাদেশে নোবেল প্রাইজ পাওয়া লোকজনদের সন্দেহের চোখে দেখা হয়।

আবার বকবকানি শুরু করেছিস। চুপ করতে বললাম না?

বল্টুভাইকে দেখে আমি চমকালাম। পিএইচডি শুনলেই আমাদের চোখে চাপাভাঙা বিরক্ত চোখের মানুষের ছবি ভাসে, যার ঠোঁটে থাকে অবজ্ঞার হাসি। যাদের এমন ভারী ডিগ্রি নেই তাদের দিকে এরা এমনভাবে তাকান যেন বনমানুষ দেখছেন। হার্ভার্ডের এই পিএইচডি অত্যন্ত সুপুরুষ। মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ। মাথাভর্তি সাদাকালো চুল। মাজেদা খালার কথা সত্যি। উনার চোখে দিশেহারা ভাব।

হার্ভার্ডের পিএইচডি'র কোমরে হোটেলের টাওয়েল প্যাঁচানো। তিনি খালি গায়ে বিছানার উপর বসে আছেন। তাঁর বাঁ-হাতে চায়ের কাপ। ডানহাতে একটা চামচ। তিনি চায়ের কাপে চামচ ডুবিয়ে চা তুলে এনে মুখে দিচ্ছেন। শিশুরা গরম চা এইভাবে খায়। বয়স্ক কাউকে এই প্রথম দেখলাম।

আমি বললাম, বল্টুভাই, ভালো আছেন?

তিনি বললেন, ভালো আছি।

আপনার জন্যে কয়েকটা জিনিস এনেছি। মাজেদা খালা পাঠিয়েছেন।

ডিকশনারি কি আছে?

হ্যাঁ আছে।

একটু কষ্ট করে দেখবে ডিকশনারিতে 'তুতুরি' বলে কোনো শব্দ কি আছে? তুমি কি এই শব্দ আগে শুনেছ?

না।

প্লিজ খুঁজে দেখো। তোমাকে তুমি তুমি করে বলছি বলে ভেবে বসবে না আমি তোমাকে অবজ্ঞা করছি। তুমিও আমাকে তুমি বলতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। বাংলা একটা স্ট্রেঞ্জ ভাষা—আপনি তুমি তুই।

জাপানি আরও খারাপ ভাষা, সেখানে পাঁচ সম্বোধন। অতি সম্মানিত আপনি, সম্মানিত আপনি, তুমি, তুই, নিম্নশ্রেণীর তুই।

বল্টুভাই 'Oh God!' বলে গরম চা



খানিকটা বিছানায় ফেলে দিলেন। এখন তাকে শিশুদের মতো অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে।

আমি ডিকশনারি খুলে বললাম, শব্দটা আছে। এর অর্থ 'সাপুড়ের বাঁশি'।

গুড। ভেরি গুড।

আমি বললাম, আপনি চামচে করে চা খাচ্ছেন কেন?

ঠোঁট পুড়ে গেছে। গরম কাপ ঠোঁটে লাগাতে পারছি না। এইজন্যে চামচে খাচ্ছি। ঠোঁট কীভাবে পুড়েছে জানতে চাও?

না। 'তুতুরি' দিয়ে কী করবেন?

কিছু করব না। অর্থটা শুধু জানলাম। তুতুরি একটা মেয়ের নাম। আমি নামের অর্থ জানতে চাইলাম। সে অর্থ বলতে পারল না। এরপর যখন তার সঙ্গে দেখা হবে, তাকে নামের অর্থ বলে দেব। সে নিশ্চয়ই খুশি হবে। তোমার কি ধারণা খুশি হবে না?

খুশি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

কম কেন?

আপনি তাকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন, তুমি মূর্খ মেয়ে, নিজের নামের অর্থ জানো না। এটা তার ভালো লাগার কথা না।

তা হলে ওই প্রসঙ্গ থাক। নামের অর্থ বলার দরকার নেই। একটা কাজ করলে কেমন হয়—বাংলা ডিকশনারিটা তাকে উপহার দিয়ে যদি বলি, এই মেয়ে দেখো তো তোমার নামের অর্থ খুঁজে পাও কি না। এই বুদ্ধি তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে?

বল্টুভাইকে আমার কাছে মোটামুটি স্বাভাবিক মানুষ বলেই মনে হলো। তবে আমার প্রতি তার আচরণে কিছুটা অস্বাভাবিকতা আছে। আমি তাঁর কাছে নিতান্তই অপরিচিত একজন। তিনি আমার সঙ্গে এমন আচরণ করছেন যেন আমি তাঁর অতি পরিচিত একজন। এত পরিচিত যে তাঁকে বল্টুভাই ডাকতে পারে।

একটু কি কষ্ট করে দেখবে 'ফুতুরি' বলে কোনো শব্দ আছে কি না?

আমি ডিকশনারি উল্টেপাল্টে বললাম, নাই। বাংলায় নতুন একটি শব্দ যুক্ত করলে কেমন হয়? ফুতুরি!

এর অর্থ কী?

ফুঁ দিয়ে যে বাঁশি বাজায় ফুতুরি। বাঁশি, সানাই, ব্যাগপাইপ ট্রাম্পেট সব হবে ফুতুরি গ্রুপের বাদ্যযন্ত্র। আপনার কাছে কি পরিষ্কার হয়েছে? নাকি আরও পরিষ্কার করব?

পরিষ্কার হয়েছে।

নতুন নতুন শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে যুক্ত করা প্রয়োজন।

অবশ্যই প্রয়োজন।

বল্টুভাইয়ের চোখ হঠাৎ চকচক করে উঠল। নিশ্চয়ই নতুন কিছু মাথায় এসেছে। এই শ্রেণীর মানুষ আমি আগেও দেখেছি। মুখে কথা বলার আগে এদের চোখ কথা বলে। সারাক্ষণ মাথায় নতুন নতুন আইডিয়া আসতে থাকে।

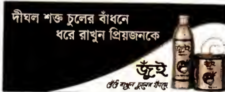
বল্টুভাই বললেন, তুমি ডিকটেশন নিতে পারো? আমি বলব, তুমি লিখবে। পারবে না?

পারব।

টেবিলের ড্রয়ারে হোটেলের কাগজ আছে, কলম আছে। কাগজ-কলম নিয়ে টেবিলে বসো। আমি খুবই লজ্জিত, তোমার নাম ভুলে গেছি।

আপনার লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। আমি এখনো আপনাকে নাম বলার সুযোগ পাই নি। আমার নাম হিমু।

হিমু, তুমি কি তৈরি? ডিকটেশন দেওয়া শুরু করব?



করুন।

লিখো—

সভাপতি

বাংলা একাডেমী

শ্রদ্ধাভাজনেষু।

বিষয় : বাংলা শব্দভাণ্ডারে নতুন শব্দ সংযোজন।

জনাব,

ফুতুরি নামের একটি শব্দ আমি বাংলা শব্দভাণ্ডারে যুক্ত করতে চাচ্ছি। ফুঁ দিয়ে যেসব বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় তাদের সাধারণ নাম হবে ফুতুরি। যেমন, বাঁশি, সানাই, ট্রাম্পেট, ব্যাগপাইপ।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমাকে বাধিত করুন।

বিনীত

বল্টু

আমি বললাম, বল্টু নাম ব্যবহার করবেন? পোশাকি নামটা দিন।

তিনি বললেন, তুমি বল্টুভাই বল্টুভাই করছ তো, এ জন্যে মাথায় বল্টু নামটা ঘুরছিল। বল্টু কেটে দিয়ে আমার ভালো নাম দিয়ে দাও—চৌধুরী খালেকুর রহমান। তবে বল্টু নামটা আমার পছন্দের। আমি যখন স্বপ্নে নিজেকে দেখি, তখন সবাই আমাকে বল্টু ডাকে। স্বপ্ন-বিষয়ে তোমাকে একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য দিতে পারি। দেব?

দিন।

একমাত্র স্বপ্নেই মানুষ নিজেকে নিজে দেখতে পায়। বাস্তব জগতে মানুষ নিজেকে দেখে না।

আয়নায় তাকালেই তো নিজেকে দেখবে।

না দেখবে না। আয়নায় দেখবে তার মিরর ইমেজ। এখন বুঝেছ?

জি।

গুড ভেরি গুড। তোমাকে চাকরিতে বহাল করা হলো। কাল সকালে জয়েন করবে।

আমি সব সময় অন্যদের চমকে দিয়ে আনন্দ পাই। এই প্রথম বল্টুভাই আমাকে চমকালেন। আমি তাঁর কাছে কোনো চাকরির জন্যে আসি নি। কয়েকটা জিনিস দিতে এসেছিলাম।

বল্টুভাই বললেন, এসি আছে এমন একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করবে। এই মাইক্রোবাস দশ দিন আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমরা সকাল দশটার মধ্যে নেত্রকোনা জেলার সোহাগী গ্রামে চলে যাব। দশ দিন থাকব।

আমি বললাম, জি আচ্ছা স্যার।

স্যার বলছ কেন?

আপনি আমার বস, এইজন্যে স্যার বলছি।

তুমি বল্টুভাই ডাকছিলে, শুনতে ভালো লাগছিল। আমি ট্রেডিশন্যাল বস না। তোমার চাকরিও চুক্তিভিত্তিক। আমি বই লেখা যেদিন শেষ করব, তার পরদিন তোমার চাকরিও শেষ।

বল্টুভাই, আমার কাজটা কী?

মিসেস মাজেদা তোমাকে কিছু বলেন নি?

জি-না।

তুমি নানানভাবে আমাকে সাহায্য করবে, যেন বইটা লিখে শেষ করতে পারি।

কী বই?

বইয়ের নাম হচ্ছে 'ঈশ্বর শূন্য আত্মা শূন্য'। বইয়ে প্রমাণ করব, ঈশ্বর বলে কিছু

, আত্মা বলেও কিছু নেই।

আপনার তো রগ কেটে ফেলবে।

কে রগ কাটবে ?

আমাদের রগ কাটার লোক আছে। এনাটমিতে বিশেষ পারদর্শী। এরা আল্লাহ, ধর্ম এইসব বিষয়ে উল্টাপাল্টা কিছু বললে হাসিমুখে রগ কেটে দিয়ে চলে যায়।

কী অদ্ভুত কথা!

আমি বললাম, বল্টুভাই! আপনি চিন্তিত হবেন না। এরা শুধু রগ কাটে, মেরে ফেলে না। যাদের রগ কেটেছে, তারা বলেছে যে ব্যথাও তেমন পাওয়া যায় না। শুধু বাকি জীবন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। হুইল চেয়ারে চলাফেরা করতে হয়।

লেগ পুলিং করছ নাকি ?

জি-না স্যার। সত্যি কথা বলছি।

প্রবলেম হয়ে গেল তো।

স্যার, আপনি বরং অন্য একটা বই লিখুন। বই লিখে প্রমাণ করুন 'ভূত আছে'।

ভূত আছে প্রমাণ করব কীভাবে ?

জটিল সব ইকোয়েশন লিখে প্রমাণ করবেন ভূত আছে। হার্ভার্ডের পিএইচডি যদি বই লিখে প্রমাণ করে ভূত আছে, তা হলে হইচই পড়ে যাবে। হাজার হাজার কপি বই বিক্রি হবে। নানান ভাষায় অনুবাদ হবে। হিন্দি ভাষায় বইটার নাম হবে 'ভূত হ্যায়'।

বল্টুভাই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি বললাম, আপনি চাইলে বাংলাদেশের নানান শ্রেণীর ভূতদের বিষয়ে আমি আপনাকে তথ্য দেব। মামদো ভূতের নাম শুনেছেন স্যার ?

মামদো ভূত ?

মুসলমান মরে যে ভূত হয় তাকে বলে মামদো ভূত। হিন্দু ব্রাহ্মণ মারা গেলে হয় ব্রহ্মদত্তি। খাণ্ডারিনা মহিলা মারা গেলে পেত্নী হয়। শাকচুন্নি নামের আরেক শ্রেণীর মহিলা ভূত আছে। এরা ভয়ঙ্করটাইপ। হিন্দু বিধবারা মরে হয় শাকচুন্নি। ফিজিক্সের পিএইচডি মারা গেলে কী ভূত হয় তা অবশ্য আমার জানা নেই।

বল্টুভাই হাত উঁচিয়ে আমাকে থামালেন। শান্ত গলায় বললেন, তুমি অতি বিপদজনক মানুষদের একজন। তুমি আমাকে কনফিউজ করার চেষ্টা করছ এবং খানিকটা করেও ফেলেছ। তোমার চাকরি নট। তোমাকে আমার এখানে আসতে হবে না। Now get lost!

স্যার, চলে যেতে বলছেন ?

হ্যাঁ। খুব অভদ্রভাবে বলেছি তার জন্যে দুঃখিত।

যাওয়ার আগে একটা কথা কি বলব ?

বলো। মনে রেখো এটা হবে তোমার লাস্ট কথা।

আমি বললাম, স্যার, ফিজিক্সের জটিল বিষয় পড়ে আপনার মাথায় গিট্টু লেগে গেছে। কেরামত চাচার সঙ্গে দেখা করলে আপনার গিট্টু কেটে যাবে। আপনি বললে আপনাকে উনার কাছে নিয়ে যাব। উনি আপনার মাথার গিট্টু ছুটিয়ে দিবেন।

কেরামত কে ?

গেণ্ডারিয়া থাকেন। বিসমিল্লাহ হোটেলের বাবুর্চি।

সে কী করবে ?

আপনার সঙ্গে হাসিতামাশা করবে, আপনার মাথার গিট্টু ছুটে যাবে।

বল্টুভাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমি প্রচণ্ড রেগে গেছি। অনেক কষ্টে নিজের রাগ সামলাচ্ছি। খুব খুশি হব তুমি যদি বিদায় হও।

জি আচ্ছা স্যার।

হোটেলের ঘর থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ করে বল্টুভাই দরজা বন্ধ করলেন। বেচারা নিষ্প্রাণ দরজাকে বল্টুভাইয়ের রাগ ধারণ করতে হলো। দরজার কথা বলার শক্তি থাকলে সে চেঁচিয়ে বলত 'উফরে গেছিরে'। ফাইভ স্টার হোটেলের দরজার ভাষা 'উফরে গেছিরে' টাইপ হবে না। সে বলবে 'ওহ্ শীট'।

আমি চৌধুরী আখলাকুর রহমান বল্টু

আমি প্রচণ্ড রেগে গেছি। রাগ সামলানোর চেষ্টা করছি। প্রচণ্ড শব্দে দরজা বন্ধ করার হাস্যকর চেষ্টা করেছি। রেগে গেলেই মানুষ হাস্যকর কর্মকাণ্ড করে।

হিমু নামের ছেলেটির সঙ্গে রাগ করার তেমন যৌক্তিকতাও এখন খুঁজে পাচ্ছি না। সে সরল ভঙ্গি করে কিছু পেঁচানো কথা বলেছে। এ রকম করে কথা বলাই হয়তো তার স্বভাব। সে যদি আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করত, তা হলে তার উপর রাগ করা যেত।

বিজ্ঞান অনেকদূর এগিয়েছে কিন্তু মানবিক আবেগের কোনো সমীকরণ এখনো বের করতে পারে নি।

পদার্থবিদ এবং ম্যাথমেটিশিয়ানদের উচিত নিউরো বিজ্ঞান পড়া। নিউরো বিজ্ঞানের বিজ্ঞানীরা অংক জানেন না। পদার্থবিদ্যা জানেন না।

শ্রোডিনজারের মতো কেউ একজন আবেগের সমীকরণ বের করে ফেললে মানব জাতির কল্যাণ হতো। আবেগের সমীকরণ বের করা কি সম্ভব হবে ?

নিউরো বিজ্ঞানীরা ছেলেখেলাটাইপ বিজ্ঞান করছে। তারা বলছে এই আবেগের জন্য মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোবে, ওই আবেগের জন্য থেলামসে। যত বুলশিট! জন্য কোথায় তা দিয়ে কী হবে ? আবেগটা কী তা বের করো। সময়ের সঙ্গে আবেগের পরিবর্তন বের করো। আমাদের দরকার টাইম ডিপেনডেন্ট সমীকরণ এবং সমীকরণের সমাধান।

লক্ষ করলাম আমার রাগ পড়ে গেছে এবং আমি এক ধরনের অবসাদবোধ করছি। রাগের সময় মস্তিষ্কের প্রচুর অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে। রাগ কমে যাওয়ার পর হঠাৎ শরীরে সাময়িক ঘাটতি দেখা যায়। আমার যা হচ্ছে।

আমি হোটেলের রিসেপশনে টেলিফোন করলাম, হলুদ পাঞ্জাবি পরা কেউ বের হচ্ছে কি না ? তারা জানাল, না।

হিমু ছেলেটিকে 'সরি' বলা উচিত। সমস্যা হচ্ছে, সে যোগাযোগ না করলে আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব না। মিসেস মাজেদাকে বললে তিনি হয়তো ব্যবস্থা করবেন। তাঁর টেলিফোন নাম্বার আমার কাছে নেই। তিনি নাম্বার লিখে দিয়েছিলেন, আমি হারিয়ে ফেলেছি। জিনিস হারানোতে আমার দক্ষতা সীমাহীন। আমার পিএইচডি থিসিসের ফার্স্ট ড্রাফট হারিয়ে ফেলেছিলাম। বাংলাদেশে এসে হারিয়েছি আমেরিকান পাসপোর্ট। অ্যাম্বাসির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা সন্দেহজনক কথাবার্তা বলছে। ভাবটা এ রকম যেন আমি কাউকে পাসপোর্টটা দিয়ে দিয়েছি।

আমি ড্রয়ার খুলে কাগজ নিয়ে লিখলাম, হিমু। এটি একটি অর্থহীন কাজ। আমরা অর্থহীন কাজ করতে পছন্দ করি। অর্থহীন কাজ শুধু না, অর্থহীন প্রশ্ন করতেও পছন্দ করি।

একবার ক্লাসে বক্তৃতা দিচ্ছি, আমার এক ছাত্রী বলল, স্যার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে বিগ ব্যাং থেকে। বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল ?

অর্থহীন প্রশ্ন। আমি পড়াচ্ছি স্পেশাল থিওরি অব রিয়েলিটি। বিগ ব্যাং না।

আমি বললাম, তোমার নাম কী ?

সে বলল, সুশান।

আমি বললাম, সুশান সময়ের শুরু

হয়েছে কোথেকে ?

সে বলল, বিগ ব্যাং থেকে।

আমি বললাম, সময় যেহেতু বিগ ব্যাং থেকে শুরু হয়েছে তার আগে তো কিছু থাকতে পারে না।

সুশান বলল, বিগ ব্যাং-এর আগে কি ঈশ্বরও ছিলেন না ?

আমি বললাম, ইয়াং লেডি, ঈশ্বরও ছিলেন না। সবকিছুর শুরু বিগ ব্যাং থেকেই। ঈশ্বর বলে কিছু থেকে থাকলেও তার শুরু বিগ ব্যাং থেকে।

সুশান মেয়েটি অর্থহীন প্রশ্ন করে আমার ভেতর অনেক অর্থহীন প্রশ্ন তৈরি করে দিয়েছে। মাথা খানিকটা এলোমেলো করে দিয়েছে। আমি এলোমেলো মাথা ঠিক করার জন্য বড় ভেকেশন নিয়েছি। প্রথম গেলাম স্পেনে। কারণ শ্রোডিনজারের মাথা যখন এলোমেলো হয়ে গেল, তখন মাথা ঠিক করার জন্য তাঁর এক গোপন বান্ধবী নিয়ে গেলেন স্পেনের বার্সেলোনায়। বান্ধবীর সঙ্গে যৌনক্রিয়ার মাঝখানে তাঁর মাথার এলোমেলো ভাব হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি পেয়ে গেলেন বিখ্যাত শ্রোডিনজার ইকুয়েশন।

বান্ধবীকে ফেলে লাফ দিয়ে কাগজ-কলম নিয়ে টেবিলে বসলেন। বান্ধবী বলল, কী হয়েছে ?

শ্রোডিনজার বললেন, হয়েছে তোমার মাথা। You go to hell!

স্পেনে আমার মাথার জট কাটে নি। আমার কোনো বান্ধবী ছিল না—এটা একটা কারণ হতে পারে।

বাংলাদেশে এসে দামি হোটেলে বসে সময় কাটাচ্ছি। জানালা দিয়ে একবার বাইরেও তাকাচ্ছি না। হিমু বলেছে জনৈক কেরামত আমার মাথার জট খুলে দেবে। সে নাকি কোন রেস্টুরেন্টের বাবুর্চি। আমি হিমু নামের পেছনে লিখলাম 'কেরামত' তারপর লিখলাম 'তুতুরি'। 'তুতুরি' নাম লেখার পেছনে কোনো ফ্রয়েডিয়ান সাইকোলজি কি কাজ করছে ?

আমি 'তুতুরি' নামটা কেটে দিলাম। নারীসঙ্গ আমার প্রিয় না। তাদের আমার আলাদা প্রজাতি মনে হয়।

২

অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের চেনা যায় 'কান' দিয়ে। তাদের দুটি কানের একটি চ্যাপ্টা ধরনের হয়। কানের সঙ্গে মোবাইল ধরে সারাক্ষণ কথা বলার কারণে কর্ণ বেচারার এই দশা।

আমি বাংলা একাডেমীর ডিজি

সাহেবের সামনে এক ঘণ্টা দশ মিনিট ধরে বসে আছি। মোবাইল কানে ধরে তিনি সারাক্ষণ কথা বলে যাচ্ছেন। একজনের সঙ্গে না, নানানজনের সঙ্গে। মাঝে মাঝে আঙুলের ইশারায় আমাকে অপেক্ষা করতে বলছেন। এই সময় তাঁর মুখ হাসিহাসি হয়ে যাচ্ছে। আমার দিকে হাসিমুখে তাকানোর একটাই কারণ—ডিজি সাহেব আমাকে তাঁর নিজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ভাবছেন। গুরুত্বপূর্ণ লোকজনকেই শুধু তাঁর পিএস খাসকামরায় ঢুকতে দেয়। অভাজনরা সেই সুযোগ পায় না। যেহেতু আমি পেয়েছি আমি গুরুত্বপূর্ণ কেউ।

আমার এই বিশেষ ঘরে ঢোকার রহস্য সরল মিথ্যাভাষণ। আমি পিএস সাহেবের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলেছি, আমি প্রধানমন্ত্রীর একটি গোপন চিঠি নিয়ে এসেছি। এই চিঠি স্যারের হাতে হাতে দিতে হবে।

কারও সঙ্গে গলা নামিয়ে কথা বললে সেও গলা নামিয়ে কথা বলে, এটাই নিয়ম। পিএস সাহেব গলা নামিয়ে বললেন, চিঠিতে কী লেখা?

আমি বললাম, প্রধানমন্ত্রীর চিঠির বিষয়বস্তু তো আমার জানার কথা না, তবে অনুমান করছি ডিজি সাহেবের দিন শেষ।

বলেন কী?

ডিজি সাহেব প্রধানমন্ত্রীর ব্ল্যাকবুকে চলে গেছেন।

পিএস বললেন, এরকম ঘটনা যে ঘটবে তার আলামত অবশ্যি পেয়েছি। যান আপনি স্যারের ঘরে চলে যান। আমি স্যারকে জানাচ্ছি যে আপনি যাচ্ছেন।

উনাকে আগেভাগে কিছু জানানোর দরকার নেই। যা বলার আমি সরাসরি বলব। গোপনীয়তার ব্যাপার আছে।

অবশ্যই! অবশ্যই!

ডিজি সাহেবের টেলিফোন শেষ হয়েছে। তিনি হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, আপনার জন্যে কী করতে পারি?

আমি বললাম, আপনি আমার জন্যে কিছু করতে পারেন না। তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে কিছু করতে পারেন।

তার মানে?

এক ভদ্রলোক বাংলা শব্দভাণ্ডারে নতুন একটি শব্দ যোগ করতে চাচ্ছেন। আমি সেই প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। শব্দটা হলো 'ফুতুরি'। ফুতুরি হবে ফুঁ দিয়ে যেসব বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় তার সাধারণ নাম।

ডিজি সাহেব চোখ-মুখ কঠিন করে বললেন, এইসব ব্রেইন ডিফেক্টদের সকাল-বিকাল থাপড়ানো দরকার।

আমি বললাম, যথার্থ বলেছেন স্যার। উনি আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। চিঠিটাতে কি একটু চোখ বোলাবেন?

চিঠি আপনি আঁস্তাকুড়ে ফেলুন এবং আপনি এই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে চলে যাবেন। আপনাকে এই ঘরে এন্ট্রি দিল কীভাবে?

আপনার পিএস সাহেব ব্যক্তিগত বিবেচনায় দিয়েছেন। উনার দোষ নাই। যখন শুনেছেন আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এসেছি তখনই উনি নরম হয়ে গেছেন। অবশ্যি নরম হওয়াটা উচিত হয় নাই। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আলতু-ফালতু লোকজন তো আসতে পারে। তাই না স্যার?

ডিজি সাহেব সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে গেলেন। তার চেহারায় হাবাগোবা ভাব চলে এল। আমি বললাম, যে ভদ্রলোক বাংলা ভাষায় নতুন একটি শব্দ দিতে চাচ্ছেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আমন্ত্রণে বাংলাদেশে এসেছেন। ভদ্রলোক পদার্থবিদ্যায় হার্ভার্ড থেকে পিএইচডি করেছেন। এখন আছেন সোনারগাঁ হোটেলে। রুম নাম্বার চার শ' সাত। আপনি কি উনার সঙ্গে কথা বলবেন? আপনার পিএসকে বললেই সে ফোন লাগিয়ে দিবে।

অবশ্যই কথা বলব। কেন কথা বলব না! উনার চিঠিটা দিন। পড়ি। এর মধ্যে সোনারগাঁ হোটেলে লাইন লাগাতে বলছি।

ডিজি স্যারের মুখ তেলতেলে হয়ে গেল। শরীরের ভেতরের তেল চুইয়ে বের হওয়া শুরু হয়েছে। দর্শনীয় দৃশ্য। বল্টুভাইয়ের সঙ্গে তাঁর টেলিফোনে কথাবার্তা হলো। বল্টুভাই কী বললেন শুনতে পারলাম না, তবে ডিজি সাহেবের তৈলাক্ত কথা শুনলাম।

আপনার চিঠি পড়ে ভালো লাগল। বাংলা ভাষাকে আপনার মতো মানুষরা সমৃদ্ধ করবে না তো কারা করবে? শব্দটাও সুন্দর বের করেছেন—ফুতুরি। শুরু হয়েছে ফু দিয়ে। ধ্বনিগত মাধুর্য আছে। আগামী মাসের পনেরো তারিখ কাউন্সিল মিটিং আছে। আপনার প্রস্তাব কাউন্সিল মিটিংয়ে তোলা হবে। আশা করছি পাস হয়ে যাবে। যদি পাস হয় তা হলে বাংলা একাডেমীর অভিধানে এই শব্দ চলে আসবে। আপনাকে অগ্রিম অভিনন্দন। আমি খুবই খুশি হব যদি একদিন সময় করে বাংলা একাডেমী ঘুরে যান।

আমার কাজ শেষ। ডিজি স্যারের দিকে তাকিয়ে বিনয়ে নিচু হয়ে বললাম, স্যার যাই। আপনার সঙ্গে কথা বলে বিমল আনন্দ পেয়েছি।

ডিজি স্যার বললেন, আচ্ছা আচ্ছা।

আমি বললাম, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সামান্য সেবা করার সুযোগ যদি দেন। আমি একটা নতুন শব্দ দিতে চাই। শব্দটা হলো 'ভুতুরি'।

ভুতুরি?

জি স্যার, ভুতুরি। এর অর্থ হবে ভূতের নাকে ফুঁ দিয়ে বাজানো বাঁশি।

ভূতের বাঁশি?

জি স্যার, ভূতের বাঁশি। এটা বিশেষ্য। বিশেষণ হবে ভুতুরিয়া। ডাকাতিয়া বাঁশির মতো ভুতুরিয়া বাঁশি। শচীন কর্তার ডাকাতিয়া বাঁশি গানটা কি শুনেছেন? 'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি।'

ডিজি সাহেব অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছেন। হিসাব মিলাতে পারছেন না। আমি হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, কাউন্সিল মিটিংয়ে বল্টুভাইয়ের 'ফুতুরি' শব্দটার সঙ্গে আমার 'ভুতুরি' শব্দটা যদি তোলেন খুব খুশি হব।

বল্টুভাই কে?

হার্ভার্ডের পিএইচডির ডাকনাম বল্টু। সবাই তাকে 'বল্টু' নামে চেনে। এই নামেই ডাকে। আপনি যদি তাকে মিস্টার বল্টু ডাকেন, উনি রাগ করবেন না। খুশিই হবেন। স্যার যাই।

হতাশ এবং খানিকটা হতভম্ব অবস্থায় ডিজি সাহেবকে রেখে আমি বের হয়ে এলাম। ফুতুরির সঙ্গে ভুতুরি যুক্ত হওয়ায় তিনি খানিকটা বিপর্যস্ত হবেন—এটাই স্বাভাবিক। বেচারার আজ সকালটা খারাপভাবে শুরু হয়েছে। তাঁর কপালে আজ সারা দিনে আর কী কী ঘটে কে জানে!

আমার জন্যে দিনটা ভালোভাবে শুরু হয়েছে এটা বলা যেতে পারে। দিনের প্রথম চায়ের কাপে একটা মরা মাছি পেয়েছি। মৃত মাছি চায়ে ভেসে থাকার কথা, এটি আর্কিমিডিসের সূত্র অগ্রাহ্য করে ডুবে ছিল। চা শেষ করার পর স্বাস্থ্যবান মাছিটাকে আমি আবিষ্কার করি। চায়ের কাপে মৃত মাছি ইঙ্গিতবহ। চায়নিজ গুপ্তবিদ্যায় চা শেষ করে কাপের তলানির চায়ের পাতার নকশা বিবেচনা করা হয়। চায়ের পাতায় যদি কোনো কীটপতঙ্গের আকার দেখা দেয়, তা হলে বুঝতে হবে আজ বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটবে। আমার চায়ের কাপের তলানিতে চায়ের পাতায় কীটপতঙ্গের নকশা না, সরাসরি মাছি।

আজ নিশ্চয়ই কিছু ঘটবে।

"মনে মনে সোনার মাছি খুন করেছি" কবিতার লাইন বলে বাংলা একাডেমী থেকে বের হলাম। হাতের মুঠোয় ডিজি সাহেবের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনের নাম্বার। পিএস সাহেব আগ্রহ করে লিখে দিয়েছেন। এই নাম্বার হট লাইনের

নাম্বারের মতো। যত রাতেই ফোন করা হোক, ডিজি সাহেব লাফ দিয়ে টেলিফোন ধরবেন। ফুতুরি ভুতুরি নিয়ে তিনি কী পরিকল্পনা করেছেন মাঝে মাঝে টেলিফোন করে জানতে হবে।

আকাশে মেঘ আছে। মেঘ সূর্যকে কাবু করতে পারছে না। মেঘের ফাঁকফোকর দিয়ে সূর্য উঁকি দিচ্ছে, চনমনে রোদ ছড়িয়ে দিচ্ছে। গায়ে রোদ মাখতে মাখতে এগোচ্ছি।

কয়েকজন ভিক্ষুকের সঙ্গে দেখা হলো। এরা ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখল, কাছে এগিয়ে এল না। ভিক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে ভিক্ষুকদের সিক্সথ সেন্স প্রবল হয়ে থাকে। এরা ধরে ফেলেছে আমার কাছে কিছু পাওয়ার আশা নেই।

কদমফুল বিক্রেতা দুজন ফুলকন্যাকে দেখলাম। এদের নজর প্রাইভেট কারে বসা যাত্রীদের দিকে, আমার মতো ভবঘুরের দিকে না। তারপরেও একজন হেলাফেলা ভঙ্গিতে বলল, ফুল নিবেন?

আমি বললাম, হুঁ।

এমন তো হতে পারে যে বিশেষ ঘটনা ঘটবে বলে মনে হচ্ছে সেই ঘটনার প্রধান চরিত্র ফুলকন্যা। মেয়েটার চেহারা মিষ্টি তবে হাতভর্তি ফুলের কারণেও চেহারা মিষ্টি মনে হতে পারে। ফুল হাতে নেওয়ামাত্র যে-কোনো মেয়ের চেহারা মিষ্টি হয়ে যায়। একইভাবে বন্দুক হাতে সুশ্রী মহিলা পুলিশকেও কর্কশ দেখায়। বন্দুকের কারণেই দেখায়।

ফুলের দাম কত?

দুই টেকা পিস।

এত দাম! পাইকারি দর কত?

ফুলকন্যা আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রেড লাইটে দাঁড়িয়ে পড়া লাল রঙের প্রাইভেট কারের দিকে ছুটে গেল। আমি বুঝলাম আজকের বিশেষ ঘটনার সঙ্গে এই মেয়ে যুক্ত না।

'নাক বরাবর এগিয়ে যাওয়া' বলে একটা ভুল কথা প্রচলিত আছে। নাক বরাবর অর্থ হলো সোজা যাওয়া। কেউ যদি ডানদিকে ফিরে তার নাক ডানদিকে ফিরবে, সে নাক বরাবরই যাবে। আমি একটি বিশেষ ভঙ্গিতে নাক বরাবরই হাঁটছি। রাস্তায় যতবার ডান-বাঁ গলি পাওয়া যাচ্ছে ততবারই আমি ডানে মোড় নিচ্ছি। গোলকধাঁধা থেকে বের হতে হলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ঢাকা শহরকে গোলকধাঁধা ভাবলে হাঁটার এই পদ্ধতি শেষটায় আমাকে কোথায় নিয়ে যায় তা দেখা যেতে পারে। গোলকধাঁধা থেকে বের হওয়ার এই পদ্ধতি ব্রিটিশ ম্যাথমেটিশিয়ান তুরিন বের করেছেন। শেষটায় অবশ্যি তাঁর নিজের মাথায় গোলকধাঁধা ঢুকে যায়। তিনি পিস্তল দিয়ে গুলি করে তাঁর মাথার খুলি গুড়িয়ে দেন। পৃথিবীর সেরা অংকবিদদের প্রায় সবার মাথায়ই এক পর্যায়ে জট লেগে যায়। তারা পাগল হয়ে যান। যারা পাগল হতে পারেন না তারা আত্মহত্যা করেন। অংকবিদদের জীবনে এই ঘটনা কেন ঘটে তা বল্টু স্যারকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে।

ডানে মোড় নিয়ে এগুতে এগুতে আগে চোখে পড়ে নি এমনসব জিনিস চোখে পড়তে লাগল। একটা বাঁদরের দোকান দেখতে পেলাম। খাঁচার ভেতর নানান আকৃতির বাঁদর। বাঁদরের সঙ্গে হনুমানও আছে। সবগুলি বাঁদর এবং হনুমান খাঁচার ভেতর শিকল দিয়ে বাঁধা। দোকানের সামনে দাঁড়াতেই প্রতিটি বাঁদর একসঙ্গে আমার দিকে তাকাল। তারা চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না, তবে নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করছে। বাঁদরের দোকানের মালিক সবুজ লুঙ্গি পরে লাঠি হাতে টুলের উপর বসা। তার লোমশ গা। চোখ তক্ষকের চোখের মতো কোটর থেকে বের হয়ে আছে। আমি বললাম, বাঁদর কত করে?

তক্ষক-চোখা বিরক্ত গলায় বলল, বিক্রি হয় না।

বিক্রি হয় না তা হলে এতগুলি বাঁদর নিয়ে সে বসে আছে কেন এই প্রশ্ন করা হলো না। কারণ এই লোক লাঠি হাতে তেড়ে এসেছে। তার দোকানের সামনে কিছু ছেলেপিলে জড় হয়েছে। বাঁদরদের ভেংচি দিচ্ছে। তক্ষক-চোখা লোকের লক্ষ্য এইসব ছেলেপিলে। শিশুর দল তাড়া খেয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হলো।

তারা আবার আসছে। এটাই মনে হয় তাদের খেলা।

একটা চায়ের দোকান পাওয়া গেল, যার সাইনবোর্ডে লেখা— 'স্পেশাল মালাই চা'। বড় টিনের গ্লাসে করে চা দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি গ্লাসের সঙ্গে পত্রিকার কাগজ ভাঁজ করে দেওয়া, গরম টিনের গ্লাস ধরার সুবিধার জন্যে। এই চায়ের মনে হয় ভালো কাটতি। কিছু কাস্টমার দোকানের বাইরে ফুটপাতে বসে চা খাচ্ছে।

একটা রেস্টুরেন্ট পাওয়া গেল যার বাইরে লেখা—"গোসলের সুব্যবস্থা আছে। পরিষ্কার গামছা দেওয়া হয়। মহিলা নিষেধ।" একবার এসে ভালোমতো খোঁজ নিতে হবে ব্যাপারটা কী? রেস্টুরেন্টে গোসলের সুব্যবস্থা থাকার প্রয়োজনইবা পড়ল কেন?

ঘানি দিয়ে সরিষা ভাঙানোর প্রাচীন কল পাওয়া গেল। গরুর বদলে আধমরা এক ঘোড়া ঘানি ঘোরাচ্ছে। এদের সাইনবোর্ডটি চোখে পড়ার মতো—"আপনার উপস্থিতিতে সরিষা ভাঙাইয়া তেল করা হইবে। ফাঁকি ঝুঁকি নাই।"

বোতল হাতে বেঞ্চিতে কয়েকজন বসে আছে। এরা নিশ্চয়ই নিজে উপস্থিত থেকে সরিষা ভাঙিয়ে খাঁটি তেল নিয়ে বাড়ি ফিরবে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে রুগ্ন তিনটি গাভির বাথান পাওয়া গেল। খাঁটি সরিষার তেলের মতো খাঁটি গরুর দুধের সন্ধানে মনে হয় লোকজন এখানে আসে। কিংবা গাভিদের নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ি বাড়ি। খরিদ্দারের সামনে দুধ দোয়ানো হয়। তিনটি গাভির সামনেই খড় রাখা আছে, তারা খাচ্ছে না। হতাশ চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। বাছুরগুলো একটু দূরে বাঁধা। তাদের চোখেও রাজ্যের বিষণ্নতা।

ডানদিকে ঘোরা ভ্রমণ একসময় শেষ হলো। এমন এক জায়গায় এসেছি ডানে ঘোরার উপায় নেই। অন্ধগলি। শেষ প্রান্তে লালসালু দেওয়া মাজার শরিফ।

মনে হচ্ছে যে বিশেষ ঘটনা ঘটবে বলে সকাল থেকেই মনে হচ্ছিল, সেই বিশেষ ঘটনা ঘটেছে। ডানে আর যাওয়ার উপায় নেই, আমার ভ্রমণের সমাপ্তি।

মাজার মানেই কিছু হতাশ লোকজন উবু হয়ে বসে থাকবে, কেউ কেউ মাজারের রেলিং ধরে বিড়বিড় করবে। থালা হাতে ভিখিরি থাকবে। সারা রাত গাঁজা খেয়ে চোখ টকটকে লাল হওয়া খালি গায়ের রুগ্ন দু'একজন থাকবে। এরা মাজারের খাদেম না, তবে খাদেমের সাহায্যকারী। এই মাজার শূন্য। খাদেমের ঘরে খাদেম বসে আছেন। আর কেউ নেই। সম্ভবত অন্ধগলিতে মাজার হওয়ার কারণে নাম ফাটে নি।

খাদেমের চোখ বাথানের গাভিগুলির মতোই বিষণ্ন। তিনি সবুজ রঙের পাঞ্জাবি পরেছেন। মাথায় পাগড়ি আছে। পাগড়ির রঙ সবুজ। বয়স ষাটের মতো হবে। দাড়ি মেন্দি দিয়ে রাঙানো। খাদেমদের চোখেমুখে ধূর্তভাব থাকে, ইনার নেই। বরং চেহারায় খানিকটা আলাভোলাভাব আছে। খাদেম মোবাইল ফোনে কথা বলছেন। তাঁর মাথার উপর লেখা—'বাচ্চাবাবার গরম মাজার'।

এই লেখার নিচেই লাল হরফে লেখা, 'পকেটমার হইতে সাবধান।'

আমি খাদেমের দিকে এগিয়ে গেলাম। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। মোবাইল ফোন কানে ধরেই বললেন, দোয়া খায়ের করার জায়গা বাঁ দিকে। মহিলারা যাবেন ডানে। দানবাক্স মহিলা-পুরুষের আলাদা।

আমি বাঁ দিকে ঢুকেই দানবাক্স পেলাম। 'লেড়কা সে লেড়কা কা গু ভারীর' মতো দানবাক্সের তালা বড়। দান বাক্সে

লেখা 'পুং' অর্থাৎ পুরুষদের।

বাচ্চাবাবা সম্ভবত বালক ছিলেন। রেলিং ঘেরা ছোট্ট কবর। কবরের উপর এক সময় গিলাফ ছিল, বৃষ্টির পানিতে ভিজে রোদে পুড়ে গিলাফ নানা ক্ষতচিহ্ন নিয়ে সেঁটে বসেছে। মাজারের পায়ের কাছে দর্শনীয় নিম গাছ। কংক্রিটের শহরে এই গাছ ভালোমতো শিকড় বসিয়ে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে ঝলমল করছে। এত বড় নিমগাছ আমি আগে দেখি নি। নিমগাছের একটি প্রজাতির নাম মহানিম। মহানিম বটবৃক্ষের মতো প্রকাণ্ড হয়। এটি হয়তোবা মহানিম।

খাদেমের মোবাইলে কথা বলা শেষ হয়েছে। তিনি হাতের ইশারায় আমাকে ডাকলেন। আমি বিনীত ভঙ্গিতে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, পবিত্র কোরান শরিফে শয়তানের নাম কতবার আছে জানো?

আমি বললাম, জি-না।

তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বাহান্নবার। এর মরতবা জানো?

জি-না।

শয়তান এমনই জিনিস যে স্বয়ং আল্লাহ পাককে বাহান্নবার তার নাম নিতে হয়েছে। আমাদের চারিদিকে শয়তান। তার চলাফেরা রক্তের ভেতরে। বুঝেছ?

জি।

খাদেম হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে বললেন, আমার পক্ষে মাজার ছেড়ে যাওয়া সম্ভব না। একটু চা খাওয়া প্রয়োজন। তুমি কি আমাকে এক কাপ চা খিলাতে পারবে? গলির মাথায় একটা চায়ের দোকান আছে, আবুলের চায়ের দোকান। আমার কথা বললে চা দিবে। টাকা নিবে না।

হুজুর, চায়ের সাথে আর কিছু খাবেন? টোস্ট বিস্কুট, কেক?

সিগ্রেট খাব। একটা সিগ্রেট নিয়ে আসবে।

আমি বললাম, সিগ্রেট কি আবুল ভাই মাগনা দিবে? নাকি খরিদ করতে হবে?

হুজুর জবাব দিলেন না, খানিকটা বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। এর অর্থ আবুল ভাই চা মাগনা দিলেও সিগারেট দিবে না।

আবুল ভাইয়ের চেহারা মনে রাখার মতো। মানুষের কিছু দাঁত মুখের বাইরে থাকতে পারে, উনার প্রায় সবগুলোই মুখের বাইরে। মুখের বাইরে থাকার কারণেই মনে হয় দাঁতের যত্ন বেশি। প্রতিটি দাঁত ঝকমক করছে।

হুজুরের জন্যে মাগনা চা নিতে এসেছি শুনে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। অতি অশালীন কিছু কথা বললেন। অশিক্ষার কারণেই হয়তো বললেন। গরম চা শরীরের এক বিশেষ প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকাতে বললেন। আমাকে চা এবং টোস্ট বিস্কিট নগদ টাকায় কিনতে হলো।

হুজুরের সামনে চা, একটা টোস্ট বিস্কিট এবং এক প্যাকেট বেনসন এন্ড হেজেস রাখলাম। সিগারেটের প্যাকেট দেখে হুজুরের চেহারা কোমল হয়ে গেল। তিনি নরম গলায় বললেন, বাবা ম্যাচ এনেছ? আমি বললাম, জি হুজুর।

তোমার উপর আমি দিলখোশ হয়েছি। আমার যেমন দিলখোশ হয়েছে বাচ্চাবাবাও সন্তুষ্ট হয়েছেন। উনার সন্তোষ আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝি। তোমার কোনো মানত থাকলে বাচ্চাবাবারে বলো। আমি নিজেও দোয়া বখশায়ে দিব। আছে কোনো মানত?

জি আছে। বাংলা ভাষায় দুটা শব্দ ঢুকাতে চাই।

হুজুর চায়ে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে তৃপ্তি নিয়ে বললেন, দুটা কেন দশটা ঢুকাও। কোনো সমস্যা নাই। বাবার দরবারে এসেছ, খেয়াল রাখবা বাবা কৃপণ না। যা চাবা অধিক চাবা।

হুজুরের মোবাইলে কি একটা ফোন করতে পারব?

অবশ্যই পারবে, তবে কথা অল্প বলবে। বেশি কথা আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলেয়স সালামও পছন্দ করতেন না।

আমি বাংলা একাডেমীর ডিজি সাহেবকে টেলিফোন করলাম। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, কে বলছেন?

আমি অতি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, স্যার আমার নাম হিমু। সকালে আপনার সঙ্গে দুটা নতুন শব্দ নিয়ে কথা হয়েছে। একটা ফুতুরি আরেকটা ভুতুরি। ভুতুরি শব্দটার বানানে দুটা চন্দ্রবিন্দু লাগবে। ভূতের বিষয় তো, এইজন্য চন্দ্রবিন্দু। শব্দটা হবে 'ভুঁতুঁরি'।

ডিজি সাহেব লাইন কেটে দিলেন।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমি হুজুরের সামনে বসে আছি। হুজুর সিগারেট টানতে টানতে বৃষ্টি দেখছেন। তার চেহারায় উদাসভাব চলে এসেছে। আমি বললাম, হুজুর, আরেক কাপ চা কি আনব?

হুজুর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, প্রয়োজন নাই। তুমি কি পা টিপতে পারো?

আমি বললাম, আমরা বাঙালি। বাঙালি আর কিছু পারুক না-পারুক পা টিপতে পারে। হুজুরের পা কি টিপে দিব?

হুজুর উদাস গলায় বললেন, দাও। মুরুব্বিদের পা দাবানোর মধ্যে সোয়াব আছে। মুরুব্বিদের সঙ্গে আদবের সঙ্গে কথা বলাতেও সোয়াব। জন্মের সময় আল্লাহপাক প্রত্যেকের নাম ব্যাংকে একটা সোয়াবের একাউন্ট খুলে দেন। আমাদের কাজ হলো একাউন্টে সোয়াব জমা দেওয়া। বুঝেছ?

আমি হুজুরের পা দাবাতে গিয়ে দেখলাম, তার দুটা পা হাঁটুর উপর থেকে কাটা। পা কাটা মানুষের সঙ্গে ক্র্যাচ থাকে। ইনার নেই বলে কাটা পা'র বিষয়টা এতক্ষণ ধরতে পারি নি। তা ছাড়া লুঙ্গিও কায়দা করে পরেছেন। লুঙ্গির শেষ প্রান্তে স্যান্ডেল আছে।

আমি বললাম, হুজুরের পা কাটল কীভাবে?

হুজুর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আল্লাহর হুকুমে পা কাটা গেছে। এর সঙ্গে ডাক্তারের বদমাইশিও আছে। ডাক্তারের কানে শয়তান ধোঁয়া দিয়েছে। শয়তানের আছওয়াছায় ডাক্তার আমার দুটা ঠ্যাং কেটে ফেলে দিয়েছে। একটা কাটলেও চলত।

আমি বললাম, অবশ্যই নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

হুজুর লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কাটা ঠ্যাং আমাকে দেয় নাই, এটা একটা আফসোস।

কাটা ঠ্যাং দিয়ে করবেন কী?

কবর দিবার জন্য চেয়েছিলাম। কবর দিতাম। ঠ্যাং শরীরের একটা বড় অংশ। এর কবর হওয়া প্রয়োজন।

হুজুরের পা নেই, পা কীভাবে দাবাবো বুঝতে পারছি না। হুজুর বললেন, পা কাটা পড়েছে কিন্তু ব্যথা বেদনা ঠিকই আছে। পা নাই তার পরেও ব্যথা বেদনা। আঙুল পর্যন্ত কটকট করে। পায়ের আঙুলগুলা আগে ফুটায়ে দাও। অনুমান করে যেখানে আঙুল থাকার কথা সেখানে টান দাও, আঙুল ফোটানোর শব্দ শুনবে। খুবই আচানক ঘটনা।

আমি হুজুরের অদৃশ্য পা দাবাচ্ছি। অদৃশ্য আঙুল টানছি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, আঙুল টানার সময় কট করে একটা আঙুল ফুটল।

হুজুর বললেন, আঙুল ফোটার শব্দ শুনেছ?

জি।

আচানক হয়েছে?

জি।

আল্লাহপাকের আজিব বিষয় বুঝতে পেরেছ?

বুঝার চেষ্টায় আছি।

এইসব দেখেও কেউ কিছু বুঝে না।

মূর্খের মতো বলে, আল্লাহ নাই, বেহেশত-দোজখ নাই। বলে কি না বলো?

বলে।

এই ধরনের কথা বলে এমন কাউরে যদি পাও আমার কাছে নিয়া আসবা, আল্লাহপাকের কেরামতি বুঝায়ে দিব। তোমার জানামতো এমন কেউ আছে?

একজন আছে। তার নাম বল্টু। তিনি বলেন, ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই।

হুজুর তৃতীয় সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, ঈশ্বর নাই বলে এটা ঠিক আছে। ঈশ্বর হিন্দুদের বিষয়। তবে আত্মা নাই যে বলে এটা ভয়ঙ্কর কথা। তাকে আমার কাছে নিয়া আসবা, আত্মা গুলায়ে তারে খাওয়ায়ে দিব। বদমাইশ।

হুজুরের কথা শেষ হওয়ার আগেই তার আরেকটা অদৃশ্য আঙুল ফুটল।

হুজুর তৃপ্তিমাখা গলায় বললেন, শুনেছ?

জি।

আগের চেয়েও শব্দে ফুটেছে, ঠিক না?

জি ঠিক।

আল্লাহপাকের কেরামত বুঝতে পারছ?

আমি পা দাবাতে দাবাতে বললাম, আল্লাহপাকের না, আপনারটা বুঝেছি। আমি যখন অদৃশ্য আঙুল টান দেই তখন আপনি নিজের হাতের আঙুল মটকান। সেই শব্দ হয়। ম্যাজিক প্রথমবার করা ঠিক আছে দ্বিতীয়বার ঠিক না। দ্বিতীয়বারে ধরা খেতে হয়।

হুজুর বিমর্ষ হয়ে গেলেন। আমি তার অদৃশ্য পা দাবাতেই থাকলাম। বৃষ্টি থেমে গেছে তবে এখন বের হওয়া যাবে না। গলিতে হাঁটুপানি। অচেনা গলির কোথায় ম্যানহোল কে জানে! হাঁটতে গেলে ম্যানহোলে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

হুজুর গলা খাঁকারি দিলেন। আমি বললাম, কিছু বলবেন?

হুজুর বললেন, তুমি পা দাবাচ্ছ আরাম পাচ্ছি। তোমার উপর সমানে দোয়া বকসে দিচ্ছি।

ভালো করেছেন।

তোমার মতো একটা চালাক চতুর ছেলে আমার দরকার। আগে একজন ছিল হেকিম। কাজে কর্মে ভালো ছিল। কেরাতের গলা চমৎকার। মাজারের নিয়মকানুন জানে। কী করলে মাজারের আয় হয় তাও জানে। জানবে না কেন, মাজারে মাজারে খাদেমের অ্যাসিসটেন্টগিরি করাই তার কাজ। হেকিম কী করেছে শোনো, দানবাক্সের তালা ভেঙে টাকাপয়সা নিয়ে পালায়ে গেল। আমি মাফ করতে গিয়েও করি নাই। আল্লাহপাকের দরবারে নালিশ দিয়ে দিয়েছি। ইশারায় পেয়েছি আল্লাহপাক নালিশ কবুল করেছেন। এখন যে-কোনো একদিন দেখা যাবে, হেকিম এসে আমার পা চাটছে।

আমি বললাম, আপনার তো পা নাই, চাটবে কীভাবে?

হুজুর হতাশ গলায় বললেন, সেটাও একটা কথা। পা না চাটলেও হেকিম আবার যদি আসে, ক্ষমা চায়, ক্ষমা করে দিব। নবীজীকে একবার জিজ্ঞাস করা হলো, হুজুরে পাক! দুশমনকে কতবার ক্ষমা করব? নবীজী বললেন, প্রথম দফায় সত্তর বার। ভালো কথা, তুমি কি আমার এখানে চাকরি করবে?

বেতন কত দিবেন?

হুজুর বিরক্ত গলায় বললেন, মাজারের খাদেমের চাকরিতে বেতন জিজ্ঞাস করা মাজারের প্রতি অসম্মান। বলো আস্তাগফিরুল্লাহ।

আস্তাগফিরুল্লাহ।

তোমাকে মাজারের আয়ের অংশ দিব।

মাজারের কোনো আয় আছে বলে তো মনে হয় না।

হুজুর বললেন, কথা সত্য। এখন আয় নাই। দানবাক্স বলতে গেলে খালি। একটা জিনিস খিয়াল রাখতে হবে। মাজারের চন্দ্রের সাথে যোগাযোগ। চন্দ্রের কারণে জোয়ারভাটা হয়। মাজারেও জোয়ারভাটা আছে। এখন ভাটা চলতেছে।

আপনি তো দুপুরে কিছু খান নাই। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কী?

আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছি। উনি একটা ব্যবস্থা নিবেন। দেখবা সন্ধ্যার পর কোনো ভক্ত খানা নিয়া চলে আসবে। অনেকবার এ রকম হয়েছে। কথা নাই, বার্তা নাই বিয়ে বাড়ির খানা আসে। আকিকার খানা আসে, সুন্নতে খৎনার খানা আসে। সন্ধ্যা পর্যন্ত থাক, দেখো কী হয়।

আমি সন্ধ্যা পার করলাম। মাজার ঝাট দিলাম। দানবাক্সের উপর ধুলা বসেছিল, ধুলা পরিষ্কার করলাম। মাজারের ভিতর পানি জমেছিল, পানি বের করার ব্যবস্থা করলাম। হুজুর বললেন, মোমবাতি জ্বালাও। বেজোড় সংখ্যায় জ্বালতে হবে, তিন অথবা পাঁচ। আল্লাহ একা বলে তিনি বেজোড় পছন্দ করেন।

তা হলে একটা জ্বালাই?

জ্বালাও, একটাতেও চলবে।

রাত আটটার দিকে সন্দেহজনক চেহারার একজন মাজারে ঢুকল। মাজারের পেছনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে চলে গেল। হুজুর বললেন, দানবাক্সে কিছু দিয়েছে?

আমি বললাম, না।

হুজুর চাপা গলায় বলল, বদমাইশ।

রাত দশটা বাজল, খানা নিয়ে কাউকে আসতে দেখা গেল না। হুজুরের নির্দেশে দানবাক্স খোলা হলো। ভাঙতি পয়সা আর নোট মিলিয়ে একাত্তর টাকা পাওয়া গেল। হুজুর বললেন, দুই প্লেট ভুনা খিচুড়ি আর হাঁসের মাংস নিয়ে এসো। বৃষ্টি বাদলার দিনে ভুনা খিচুড়ির উপর জিনিস নাই। রাত অধিক হয়ে গেছে, তুমি থেকে যাও। বিছানা বালিশ সবই আছে। হেকিম বিছানা-বালিশ নেয় নাই। রাত বারোটার সময় আমি জিগিরে বসব। আমার সঙ্গে জিগিরে সামিল হতে পার। ব্যাংকের একাউন্টে সোয়াব বাড়বে। কি রাজি আছ?

জি হুজুর।

রাতে ঘুম ভাঙলে যদি দেখ অস্বাভাবিক লম্বা কিছু মানুষ নামাজে দাঁড়ায়েছে, তখন ভয় পাবা না। এরা ইনসান না, জ্বীন। মানুষের বেশ ধরে আসে, মাজারে মাজারে নামাজ পড়ে।

হুজুর খুব আরাম করে ভুনা খিচুড়ি খেলেন। খিচুড়ি খেতে খেতে বললেন, পায়ের আঙুল ফোটার বিষয়ে তুমি যা বলেছ তা ঠিক আছে। আমি কায়দা করে হাতের আঙুল ফোটাই। তবে শুরুতে পায়ের আঙুল ফুটতো। ভাত হাতে নিয়া মিথ্যা বলব না। তিন মাস ফুটেছে তারপর বন্ধ। আমার কথা কি বিশ্বাস করলা?

জি হুজুর।

আমার সাথে থেকে যাও, আমার সেবা করো, বিনিময়ে অনেক বাতেনি জিনিস তোমারে শিখায়ে দিব। পরী দেখেছ কখনো?

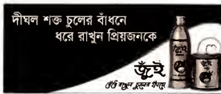
জি-না।

আমি ইচ্ছা করলে পরীর সাথে মুহাব্বতের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তবে জ্বীন পরীদের কাছ থেকে দূরে থাকা ভালো। 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুসি আল খাবায়িত।'

এর অর্থ কী?

অর্থ হলো, হে আল্লাহপাক! দুষ্ট পুরুষ জ্বীন এবং দুষ্ট মহিলা জ্বীনের অনিষ্ট থেকে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরী হলো মহিলা জ্বীন।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও বাড়তে



লাগল। আরামদায়ক আবহাওয়া। হুজুর একমনে জিগির করতে লাগলেন। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে জিগিরের শব্দ মিলে অদ্ভুত এক পরিবেশ তৈরি হলো।

রাত তিনটা পর্যন্ত আমি হুজুরের সঙ্গে জিগির করলাম। হুজুর বললেন, জিগির তোমার কলবের ভেতর ঢুকায়ে দিব। দিন রাত জিগির হতে থাকবে, তোমার নিজের কিছু করতে হবে না। বলো আলহামদুলিল্লাহ।

আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ।

হুজুর বললেন, তুমি আমার সঙ্গে থেকে যাও। দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা থাকো। দেখবা কী তোমারে দিব।

আমি বললাম, হুজুর অনুমতি দিলে ফ্রি-ল্যান্স কাজ করব।

সেটা আবার কী?

সময় সুযোগমতো মাজারের কাজ করব। হুজুরের পা টিপব।

হুজুর উদাস গলায় বললেন, ঠিক আছে তোমার বিবেচনা। জোর জবরদস্তি নাই।

চেষ্টা করব রাতে এখানে থাকতে। দিনে পারব না। কাজকর্ম আছে।

কী কাজকর্ম?

আমি জবাব দিলাম না, হুজুরের মতো উদাস হয়ে গেলাম।

হুজুর বললেন, খারাপ কোনো কাইজ কাম যদি করো তা হলে কাজ শেষ হওয়া মাত্র পীর বাচ্চাবাবার সুপারিশ নিয়া আল্লাহপাকের কাছে মাফ চাবা, মাফ পায়া যাবে। দেরি করে ক্ষমা চাইলে কিন্তু হবে না। সঙ্গে সঙ্গে মাফ মাংতে হবে।

আমি বললাম, ভালো জিনিস শিখলাম হুজুর। এখন আপনার মোবাইলটা দেন, একটা টেলিফোন করব।

এত রাতে কারে টেলিফোন করবা? আচ্ছা থাক, আমারে বলার প্রয়োজন নাই। মানুষের সবকিছু জানতে চাওয়া ঠিক না। সবকিছু জানবেন শুধু আল্লাহপাক।

আমি ডিজি স্যারকে টেলিফোন করলাম। কয়েকবার রিং হতেই তিনি ধরলেন। আতঙ্কিত গলায় বললেন, কে?

স্যার আমি হিমু। ওই যে আপনার কাছে দুটা শব্দ নিয়ে গিয়েছিলাম ফুতুরি এবং ভুঁতুরি।

কী চাও?

ভুঁতুঁরি বানানটা নিয়ে সমস্যায় পড়েছি। আমার মনে হয় একটা চন্দ্রবিন্দু থাকলেই চলবে। দুটা চন্দ্রবিন্দুতে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

ডিজি স্যার লাইন কেটে দিলেন। তবে লাইন কাটার আগে চাপা গলায় বললেন, সান অব এ বিচ!

আমি ডিজি, বাংলা একাডেমী

আমি সচরাচর গালাগালি করি না। আমার রুচিতে বাঁধে। আমার গালাগালি স্টুপিডে সীমাবদ্ধ। তবে কিছুক্ষণ আগে হিমু নামধারী একজনকে 'সান অব এ বিচ' বলেছি। এই বদ আমার পিছনে লেগেছে। রাত বাজে তিনটা পঁয়তাল্লিশ। এত রাতে আমার ঘুম ভাঙিয়ে 'ভুতুরি' বানান নিয়ে কথা বলে? এ চাচ্ছে কী? বুঝতেই পারছি কোনো একটা বিশেষ মতলব নিয়ে সে ঘুরছে। বাংলাদেশ ভরতি হয়ে গেছে মতলববাজে। কে কোন মতলব নিয়ে ঘুরে বোঝার উপায় নেই। সব মতলববাজের পেছনে দু-তিনটা মন্ত্রী-মিনিস্টার থাকে।

আমার হট লাইনের টেলিফোন নাম্বার হিমু মতলববাজটাকে কে দিল? যে দিয়েছে সেও হিমুর সঙ্গে জড়িত। আমার পেছনে একটা চক্র কাজ করছে। চক্রের প্রধানটা কে? আমার পিএস দবির কি জড়িত? কম্পাসের কাঁটা তার দিকে ঘুরে।

দবির অতি ভদ্র অতি বিনয়ী ছেলে। ভদ্রতা এবং বিনয়ের ভেতর শয়তান বসে থাকে। ভদ্রতা বিনয় ভালোমানুষি হলো শয়তানের মুখোশ।

আমি ভোর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। ভোর হলেই দবিরকে টেলিফোন করব। অতি ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করব হিমু নামের বদটাকে সে আমার গোপন নাম্বার দিয়েছে কি না। যদি দিয়ে থাকে তা হলে কেন দিল? হিমু এমন কে যে তাকে আমার গোপন নাম্বার দিতে হবে।

আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে এটা পরিষ্কার। কে করছে কেন করছে এটাই বুঝতে পারছি না। আমার প্রধান সমস্যা, আমি কাউকে না বলতে পারি না। সরকারি ছাত্রদলের এক সময়ের বড় নেতা এসে পাণ্ডুলিপি জমা দিল। পাণ্ডুলিপির নাম 'বাংলার ঐতিহ্য চেপা শুঁটকির একশত রেসিপি'। তাকে কষে চড় দেওয়া দরকার। তা না করে বললাম, একটি দেশের কালচারের অংশ রান্নাবান্না। পাণ্ডুলিপি এখনই রিভিউয়ারদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে বলে কী, রিভিউয়ার লাগবে না মন্ত্রীর সুপারিশ আছে। মন্ত্রী মহোদয় আপনাকে টেলিফোন করবেন।

আমি বললাম, অবশ্যই, অবশ্যই।

ফ্রিজ থেকে বোতল বের করে একগ্লাস ঠান্ডা পানি খেলাম। বারান্দায় বসে একটা সিগারেট শেষ করলাম। মন অস্থির হয়েছে। অস্থির অবস্থায় বিছানায় ঘুমুতে যাওয়া ঠিক না। অস্থির অবস্থায় ঘুমুতে যাওয়া মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে।

সিগারেট খাওয়ার কারণেই কি না জানি না, অস্থিরতা খানিকটা কমল। বিছানায় গিয়েছি, চোখ লেগে এসেছে আবার টেলিফোন। বদটাই কি আবার করেছে? নাম্বার সেভ করা নাই বলে বুঝতে পারছি না। টেলিফোন ধরব নাকি ধরব না? কিছুক্ষণ কথা বলে তার মতলবটা ধরা যেতে পারে।

স্যার, আমি হিমু। ভুঁতুরির হিমু।

কী ব্যাপার?

হুজুর জানতে চাচ্ছিলেন আমি এত রাতে কার সঙ্গে কথা বললাম। আপনার সঙ্গে কথা বলছি শুনে খুশি হয়েছেন।

আচ্ছা।

হুজুর বললেন, ফজর ওয়াক্ত হয়ে গেছে, নামাজটা যেন আদায় করেন। আপনি কি হুজুরের সঙ্গে কথা বলবেন?

আমি টেলিফোন বন্ধ করে বারান্দায় এসে বসলাম।

সালমা ঘুম থেকে উঠে বলল, কী ব্যাপার?

আমি বললাম, কোনো ব্যাপার না। চা করে দাও চা খাব।

সালমা বলল, রাতে কোনো খারাপ স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছ?

আমি বললাম, না।

সালমা বলল, আমি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। খুবই খারাপ। তুমি আমাকে ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছ। ছাদ থেকে মাটিতে পড়তে পড়তে আমার ঘুম ভেঙেছে।

আমি বললাম, এটা খুবই ভালো স্বপ্ন। স্বপ্নে যা দেখা যায় তার উল্টাটা হয়। পতন দেখা মানে উত্থান।

ভোর সাড়ে সাতটায় আমি দবিরকে টেলিফোন করলাম। নানা কথার পরে জিজ্ঞেস করলাম সে হিমু নামের কাউকে আমার প্রাইভেট নাম্বার দিয়েছে কি না।

দবির বলল, অসম্ভব। সে কি বলেছে যে আমি দিয়েছি?

আমি বললাম, না। সে সময়ে অসময়ে আমাকে টেলিফোন করে বিরক্ত করছে। কাল রাত তিনটা পঁয়তাল্লিশে একবার টেলিফোন করেছে।

সে বলল, যে নাম্বার থেকে টেলিফোন করেছে সেই নাম্বার আমাকে দিন আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।

এই ছেলে কি সাংবাদিক?

তা তো স্যার জানি না। আপনি বললে

আমি খোঁজ নিতে পারি।

আমি ইতস্তত করে বললাম, একাডেমীতে আমার বিরুদ্ধে কি কোনো কথাবার্তা হয়?

দবির বলল, আপনার বিরুদ্ধে কী কথাবার্তা হবে? আপনি হচ্ছেন হার্ডকোর অনেস্ট।

আমি বললাম, থ্যাংক য়্যু।

দবির বলল, তবে 'বাংলার ঐতিহ্য চেপা শুঁটকির একশত রেসিপি' বইটি যে আপনি প্রেসে ছাপার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন এটা নিয়ে কথা হবে। পত্রপত্রিকায় লেখা হবে।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। দবির বলল, চেপা শুঁটকির লেখক আরও একটা পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছেন, 'রবীন্দ্রনাথ এবং গ্রাম বাংলার ভর্তাভাজি'। সে দুটা বইয়ের রয়েলটির টাকা অ্যাডভান্স চায়। রয়েলটির টাকা পরিশোধ করার জন্যে মন্ত্রীর জোরালো সুপারিশও আছে।

আমি বললাম, ও আচ্ছা আচ্ছা। আমার বিরুদ্ধে কঠিন ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ, বাংলার ঐতিহ্য চেপা শুঁটকি সব এক সুতায় গাঁথা মালা। 'এ মণিহার আমার নাহি সাজে।'

৩

মাইকেল এঞ্জেলো বলেছেন, "মেয়েদের সবচেয়ে সুন্দর দেখায় তার কেঁদে ফেলার আগ মুহূর্তে।"

মাইকেল এঞ্জেলোর কথা সত্যি হতে পারে। মাজেদা খালার বসার ঘরের সোফায় রোগা-পাতলা এক তরুণী বসে আছে। সে হালকা সবুজ রঙের শাড়ি

পরেছে। শাড়ির সবুজ রঙ ছায়া ফেলেছে মেয়েটির মুখে। সবুজ আভায় তার চেহারা খানিকটা করুণ হয়েছে। সে মাথা নিচু করে বসে আছে। তার চোখের পাতা যেভাবে কাঁপছে তাতে বোঝাই যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কাঁদবে। তাকে অপরূপ দেখাচ্ছে। মাইকেল এঞ্জেলো এই মেয়েকে দেখলে বাটালি দিয়ে পাথর কাটা শুরু করতেন। যে ভঙ্গিতে মেয়েটি বসে আছে, তিনি সেই ভঙ্গি হয়তো সামান্য পাল্টাতেন যাতে মেয়েটির মুখ ভালোভাবে দেখা যায়।

আমি মেয়েটির কেঁদে ফেলার দৃশ্য দেখার জন্যে অপেক্ষা করছি। সে চোখ তুলে আমাকে দেখে তার কান্না সামলে ফেলল। কিছু কিছু মেয়ে দ্রুত কান্না সামলাতে পারে। এ মনে হয় সেই দলের। আমি মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলাম। মাজেদা খালা রান্নাঘরের টুলে বসে আছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনিও কিছুক্ষণের মধ্যে কাঁদবেন, তবে তাকে রূপবতী দেখাচ্ছে না। বরং কদাকার লাগছে। কেঁদে ফেলার আগে সব মেয়েকে রূপবতী মনে হয়, এই তথ্য ঠিক না।

খালা, সমস্যা কী ?

এই বাড়িতে সমস্যা তো একটাই—তোর খালু। অপরিচিত এক মেয়ের সামনে তোর খালু আমাকে কুত্তি ডেকেছে।

আমি বললাম, বাংলায় কুত্তি বলেছেন না-কি ইংরেজিতে বলেছেন ? বাংলায় কুত্তি ভয়ঙ্কর গালি, ইংরেজিতে 'বিচ' তেমন গালি না। বাংলা 'গু' শব্দ ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করা যায় না, কিন্তু ইংরেজিতে 'শীট' কথায় কথায় বলা যায়।

খালা মনে হয় অনেকক্ষণ কান্না ধরে রেখেছিলেন আর পারলেন না। শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। শোবার ঘর থেকে খালু ইংরেজিতে হুঙ্কার দিলেন। কঠিন গলায় বললেন, Get Lost! হুঙ্কার বাংলায় অনুবাদ করলে হয়, 'হারিয়ে যাও।' Get Lost হলো গালি আর 'হারিয়ে যাও' হলো বেদনার্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস। বাংলা ভাষায় ঝামেলা আছে। বাংলা একাডেমীর ডিজি সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

মাজেদা খালা নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বললেন, তোর খালুকে কি তুই বলে আসতে পারবি যে আমি তার সঙ্গে আর বাস করব না ?

আমি বললাম, আমাকে কিছু বলে আসতে হবে না। তুমি কথাবার্তা যথেষ্ট উঁচু গলায় বলছ। খালু শোবার ঘর থেকে পরিষ্কার শুনতে পারছেন।

তারপরেও তুই বলে আয়।

ঘটনার সূত্রপাত কীভাবে হলো ?

তোর খালুকে জিজ্ঞেস কর কীভাবে হলো।

সোফায় বসে যে মেয়ে কাঁদার চেষ্টা করছে, সে কে ?

আমার এক বান্ধবীর মেয়ে। আর্কিটেক্ট। ডিজাইনে গোল্ড মেডেল পাওয়া মেয়ে।

গোল্ড মেডালিস্ট কাঁদার চেষ্টা করছে কেন ?

তোর খালু অপরিচিত এই মেয়েকে পেত্নী বলেছে। বলেছে পেত্নীটাকে বিদায় করো। তাকে কোনো একটা বাঁশগাছে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে বলো।

আমি বললাম, ঘটনা যথেষ্ট জটিল বলে মনে হচ্ছে। তুমি কড়া করে চা বানাও। চা খেয়ে মাথা ঠান্ডা করি তারপর অ্যাকশান।

চা বানাচ্ছি, তুই তোর খালুকে বলে আয় আমি তার সঙ্গে এক ছাদের নিচে বাস করব না।

আমি খালু সাহেবের শোবার ঘরের দিকে (অনিচ্ছায়) রওনা হলাম।

ছুটির দিনের সকালে মাজেদা খালার বাড়িতে আসাটা বোকামি হয়েছে। খালা-খালুর সব ঝগড়া ছুটির দিনের সকালে শুরু হয়।

খালু সাহেব ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে আছেন। তাঁর ঠোঁটে পাইপ। ছুটির দিনে তিনি পাইপ টানেন। তাঁর কোলের উপর ওরহান পামুকের বই 'My name is red'। খালু সাহেবের চেহারা শান্ত। ঝড়ের কোনো চিহ্নই নেই। তিনি আমাকে দেখে শান্ত গলায় বললেন, কেমন আছ হিমু ?

আমি মোটামুটি ঘাবড়ে গেলাম। গত দশ বছরে খালু এমন শান্ত গলায় 'হিমু কেমন আছ' জিজ্ঞেস করেন নি। আমি তাঁর কাছে কীটপতঙ্গের কাছাকাছি। আমার ভালো থাকা না-থাকায় তার কিছু আসে যায় না।

খালু সাহেবের মধুর ব্যবহারে হকচকিয়ে গিয়ে বিনীত গলায় বললাম, আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন ?

খালু সাহেব বললেন, আমি ভালো আছি। ব্রিলিয়ান্ট একটা উপন্যাস পড়ছি ওরহান পামুকের। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা কীসব অখাদ্য লেখে, তাদের উচিত ওরহান সাহেবের পায়ের কাছে বসে থাকা। দাঁড়িয়ে আছ কেন! বসো।

ভয়ে ভয়ে খাটের এক কোনায় বসলাম। খালু সাহেব বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললেন, অপরিচিত একটি মেয়েকে আমি পেত্নী ডেকেছি—তার জন্যে লজ্জিত। তুমি তাকে বলে দিয়ো যে, আই অ্যাপোলোজাইজ। উপন্যাসে একটা জায়গায় পেত্নীর বর্ণনা পড়ছিলাম, সেই থেকে পেত্নী মাথায় ঘুরছিল। উত্তেজনার মুহূর্তে মুখ থেকে পেত্নী বের হয়েছে। আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলাম।

আমি বললাম, খুবই স্বাভাবিক। মহান লেখা মানুষকে আচ্ছন্ন করবেই। খালাকেও নিশ্চয়ই এই কারণে বিচ ডেকেছেন। পামুক সাহেবের বইয়ে মহিলা কুকুরের বর্ণনা পড়েছেন। সব দোষ ওরহান পামুক সাহেবের।

খালু সাহেব শান্ত গলায় বললেন, তোমার খালাকে আমি মন থেকেই বিচ বলেছি। বাইরের প্রভাবমুক্ত উচ্চারণ।

ও আচ্ছা।

তুমি তোমার খালাকে গিয়ে বলো সে যেন চলে যায়। আমি এই বিচের মুখ দেখতে চাই না।

আপনাদের দুজনের মধ্যে তা হলে তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েই গেল। খালা বলেছেন তিনি আপনার সঙ্গে এক ছাদের নিচে বাস করবেন না।

সে মুখে বলছে, আসলে যাবে না। নানান যন্ত্রণা করে আমাকে পাগল বানিয়ে পাবনার পাগলাগারদে পাঠাবে।

আমি বললাম, ঘটনার সূত্রপাত কীভাবে হয়েছে একটু কি বলবেন ?

খালু সাহেব বললেন, আমি একটা বই পড়ছি, যথেষ্ট আনন্দ নিয়ে পড়ছি, এখন ঘটনার সূত্রপাত কিংবা মূত্রপাত কিছুই বলব না। তুমি তোমার খালাকে এবং পেত্নীটাকে নিয়ে আধাঘন্টার মধ্যে বাড়ি ছাড়বে। যদি সম্ভব হয় আমাকে এক কাপ চা বানিয়ে দাও। তুমি নিজে বানাবে, বিচটাকে বলবে না।

সব বড় ম্যাজিকের কৌশল যেমন সহজ হয়, সব বড় ঝগড়ার কারণও হয় তুচ্ছ। শেষ পর্যন্ত খালু সাহেবের মুখ থেকেই কারণ জানা গেল। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, চা তুমি বানিয়েছ ?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। খালু সাহেব বললেন, চুমুক দিয়েই বুঝেছি, ঐ গুড ফর নাথিং মহিলা চা-ও বানাতে পারে না। সে শুধু পারে ঝামেলা বাড়াতে। আমার বন্ধুর ছেলে এসেছে, হার্ভার্ড পিএইচডি, তোমার খালা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তাকে বিয়ে দিবে। মেয়ে একটা জোগাড় করেছে, তুতুরি ফুতুরি কী যেন নাম।

সোফায় যে মেয়ে বসে আছে সে নাকি ?



হ্যাঁ সে। আজ সকালে কী হয়েছে শোনো—আরাম করে বই পড়তে বসেছি, ওই মেয়ে গজ ফিতা নিয়ে দেয়াল মাপামাপি শুরু করেছে। আমি শান্ত গলায় বললাম, কী করছ ? সে বলল, দেয়াল মাপছি।

আমি বললাম, দেয়াল মাপছ তা তো

দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কেন ?

সব দেয়াল ভেঙে নতুন ইন্টেরিয়ার হবে। ঘরে আলো-হাওয়া খেলবে।

আমি বললাম, আমার আলো-হাওয়ার দরকার নেই। তোমার যদি দরকার হয় তুমি বাঁশগাছে চড়ে বসে থাকো। পেত্নী কোথাকার!

খালু সাহেব বইয়ে মন দিলেন। বইয়ে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু নিশ্চয়ই পেয়েছেন। নিজের মনেই বললেন, Oh God!

খালা একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করলেন। আমরা তিনজন রাস্তায় নেমে এলাম। ঘর থেকে বের হওয়ার আগে খালা শোবার ঘরে ঢুকলেন। খালু সাহেবকে বললেন, এই যে যাচ্ছি, আর কিন্তু এ বাড়িতে ঢুকব না। আমার বাবা'র কসম, আমার মা'র কসম।

খালু সাহেব বই থেকে চোখ না তুলেই বললেন, শুনে আনন্দ পেলাম, Go to hell.

বাড়ির গেট থেকে বের হয়ে আমরা এখন ফুটপাতে। প্রবল উত্তেজনার কারণে খালা স্যান্ডেল না পরে খালি পায়ে বের হয়ে এসেছেন। এবং এই মুহূর্তে তিনি ভয়ঙ্কর কোনো নোংরা জিনিসে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। খালা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, ও হিমু কিসে পাড়া দিলাম!

আমি বললাম, মনুষ্যবর্জ্যে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছ।

মনুষ্যবর্জ্য আবার কী ?

সহজ বাংলায় 'গু'।

খালা কুঁ কুঁ জাতীয় শব্দ করলেন। তুতুরি খিলখিল করে হেসে ফেলল। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, এই মেয়ের হাসির শব্দে মধুর বিষাদ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"কাহারও হাসি ছুরির মতো কাটে। কাহারও হাসি অশ্রুজলের মতো।" হিমু না হয়ে অন্য যে কেউ হলে আমি এই মেয়ের প্রেমে পড়ে যেতাম। হিমু হয়ে পড়েছি বিপদে।

খালা বললেন, দাঁড়িয়ে মজা দেখছিস নাকি ? পা ধোয়ার ব্যবস্থা কর। সাবান আন, পানি আন। সাধারণ সাবানে হবে না, কার্বলিক সাবান আন। সারা শরীর ঘিনঘিন করছে। গোসল করব।

ফুটপাতে তোমাকে গোসল করাব কীভাবে ?

গাধা কথা বলিস না, ব্যবস্থা কর।

খালা আবার আর্তচিৎকার করলেন। তিনি একটু পিছনে ঘুরতে চেয়েছিলেন, নিষিদ্ধ বস্তু তার অন্য পায়েও লেগে গেছে। তিনি চোখ মুখ কুঁচকে বললেন, কোন হারামজাদা ফুটপাতে হাগে ?

মানবপ্রকৃতির সাধারণ নিয়ম হলো, অন্যের দুর্দশা দেখে আনন্দ পাওয়া। খালাকে ঘিরে ছোটখাটো ভিড় তৈরি হয়েছে। নানান মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। একজন হাসিমুখে বলল, সিস্টার, গুয়ে পাড়া দিয়া খাড়ায়ে আছেন কেন ? সরে দাঁড়ান।

খালা প্রশ্নকর্তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি ফেলে আমাকে বললেন, দাঁড়ায়ে মজা দেখছিস কেন ? সাবান-পানি নিয়ে আসতে বললাম না!

আমি বললাম পকেটে একটা ছেঁড়া দু'টাকার নোটও নেই। তুতুরি বলল, আমার কাছে টাকা আছে। চলুন যাই।

আমরা রাস্তা পার হলাম। আশপাশে কোনো দোকান দেখতে পাচ্ছি না। একজন চাওয়ালাকে দেখা গেল চা বিক্রি করছে। গরম চা দিয়ে পা ধোয়া ঠিক হবে কি না তাও বুঝতে পারছি না। আমি তুতুরিকে বললাম, সবচেয়ে ভালো হয় খালাকে ফেলে আমাদের দুইজনের দুদিকে চলে যাওয়া।

তুতুরি বিস্মিত গলায় বলল, কেন ?

আমি বললাম, খালা পনেরো-বিশ মিনিট আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। আমাদের ফিরতে না দেখে বাধ্য হয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফেরত যাবেন। খালা-খালুর মিলন হবে। এই মিলনের নাম মধুর মিলন না, গু মিলন।

আপনি তো অদ্ভুত মানুষ, তবে আপনার কথা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। চলুন দুজন দুদিকে চলে যাই।

যাওয়ার আগে তোমার পক্ষে কি সম্ভব আমাকে এক কাপ গরম চা খাওয়ানো ? চাওয়ালাকে দেখে চা খেতে ইচ্ছে করছে।

তুতুরি ভুরু কুঁচকে বলল, আমাকে হঠাৎ তুমি তুমি করে বলছেন কেন ?

আমি বললাম, সাত কদম পাশাপাশি হাঁটলেই বন্ধুত্ব হয়। আমরা এক শ' কদম হেঁটে ফেলেছি।

আমাকে দয়া করে আপনি করে বলবেন। চা খেতে আপনার কত লাগবে ?

পাঁচ টাকা লাগবে। চায়ের সঙ্গে একটা টোস্ট বিস্কিট খাব। টোস্ট বিস্কিটের দাম দু'টাকা। কলা দু'টাকা। সব মিলিয়ে ন'টাকা। সকালে নাস্তা না খেয়ে বের হয়েছি।

তুতুরি বলল, আমার কাছে ভাংতি ন'টাকা নেই। একটা এক হাজার টাকার নোট আছে।

আমি বললাম, ন'টাকার জন্য কেউ এক হাজার টাকার নোট ভাঙাবে সে রকম মনে হয় না। তারপরেও চেষ্টা করা যেতে পারে।

আপনার কি চা খেতেই হবে ?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। তুতুরি অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। আমি বললাম, এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিলে এক হাজার টাকার ভাংতি পাওয়া যাবে।

তুতুরি বিস্মিত গলায় বলল, আমি আপনাকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিব ?

আমাকে না, আমার বসকে। আমার বস হলেন পীর বাচ্চাবাবা মাজারের খাদেম।

আপনি মাজারে কাজ করেন ?

জি। হুজুরের পা দাবাই। মাজার ঝাড়পোছ দিয়ে পরিষ্কার করি। সন্ধ্যাবেলা মোমবাতি-আগরবাতি জ্বালাই। ভালো কথা, আপনি কি আমাদের মাজারের জন্য সুন্দর একটা ডিজাইন করে দিতে পারেন ? এমন একটা ডিজাইন হবে যে মাজারে ঢোকামাত্রই আধ্যাত্মিক ভাব হবে। মন উদাস হবে। সৃষ্টির অসীম রহস্যের অনুভবে মন বিষণ্ণও হবে।

আমি পীর বাচ্চাবাবা মাজারের ডিজাইন করব ?

আপনারা আর্টিটেক্টরা যদি পেট্রলপাম্পের ডিজাইন করতে পারেন, মাজারের ডিজাইন করতে অসুবিধা কী ? পৃথিবী বিখ্যাত আর্কিটেক্টরা মাজার ডিজাইন করেছেন।

তুতুরি চোখ সরু করে বলল, কয়েকজনের নাম বলুন।

আমি বললাম, ইশা আফেন্দি।

তুতুরি বলল, আমি আর্কিটেকচারের ছাত্রী। ইশা আফেন্দির নাম প্রথম শুনলাম।

আমি বললাম, তাজমহল সম্রাট সাজাহানের স্ত্রীর মাজার ছাড়া কিছু না। তাজমহলের ডিজাইন করেন ইশা আফেন্দি। তিনি সম্রাটের চোখ এড়িয়ে গম্বুজে তার নাম লিখে গেছেন।

তুতুরি বলল, এই তথ্য জানতাম না।

আমি বললাম, অটোমান সাম্রাজ্যে একজন আর্টিটেক্ট ছিলেন, তাঁর নাম সিনান। এই নাম তো আপনার জানার কথা।

হ্যাঁ জানি। উনার ডিজাইন আমাদের পাঠ্য।

সিনান অনেক মাজারের ডিজাইন করেছেন। এখন বলুন, আপনি কি আমাদের মাজারের ডিজাইন করে দেবেন ?

তুতুরি বলল, আসুন আপনাকে চা খাওয়াচ্ছি, সিগারেটও কিনে দিচ্ছি। সত্যি কি আপনি মাজারে কাজ করেন ? আমি কি আপনার মোবাইল টেলিফোন পেতে পারি ?

আমার কোনো মোবাইল ফোন নেই। আমার হুজুরের নাম্বারটা রেখে দিন। হুজুরের নাম্বারে টেলিফোন করলেই আমাকে পাবেন, নাম্বার দিব ?

তুতুরি শান্ত গলায় বলল, দিন।

৪

তুতুরি

আমি এই মুহূর্তে একটা সাড়ে বত্রিশভাজা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। দোকানে সবই পাওয়া যায়। চা বিক্রি হচ্ছে, বিস্কিট-কলা বিক্রি হচ্ছে, পান-সিগারেট বিক্রি হচ্ছে, বাচ্চাদের খেলনা বিক্রি হচ্ছে, এক কোনায় কনডম সাজানো আছে।

আমার সামনে হিমু নামের একজন চায়ে টোস্ট বিস্কিট ডুবিয়ে খাচ্ছে। চায়ে চুমুক দেওয়ার আগে সে কপ কপ করে বড় একটা সাগরকলা নিমিষে খেয়ে ফেলেছে। চা, টোস্ট বিস্কিট, কলা আমি তাকে কিনে দিয়েছি। এক প্যাকেট বেনসন এন্ড হেজেস সিগারেট তার জন্যে কিনেছি। এই সিগারেট সে নিয়েছে তার বসের জন্যে। এই বস নাকি পীর বাচ্চাবাবা নামের এক মাজারের খাদেম। হিমু নাকি সেই খাদেমের খিদমতগার, সহজ বাংলায় চাকর। বিষয়টা আমার কাছে যথেষ্ট খটমটে মনে হচ্ছে। আমি প্রায় নিশ্চিত হিমু আমার সঙ্গে চালবাজি করছে।

পুরুষদের জীনে নিশ্চয়ই চালবাজির বিষয়টা প্রকৃতি ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রাণীজগতে নারী প্রাণীদের ভোলানোর জন্যে পুরুষেরা নানান কৌশল করে। নাচানাচি করে, ফেরোমেন নামের সুঘ্রাণ বের করে, নানান বর্ণে শরীর পাল্টায়। মানুষের প্রকৃতিদত্ত এই সুবিধাগুলো নেই বলে সে চালবাজি করে মেয়েদের ভোলাতে চায়। তাদের প্রধান চেষ্টা থাকে আশপাশের তরুণীদের ভুলিয়ে এবং চমকে দিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। হিমু তা-ই করছে। প্রথম সুযোগেই সে আমাকে 'তুমি' ডাকা শুরু করেছিল, আমি তাকে 'আপনি'তে ফিরিয়ে দিয়েছি।

স্থাপত্যবিদ্যার কিছু জ্ঞান দিয়ে শুরুতে সে আমাকে খানিকটা চমকে দিয়েছিল। সেই চমক এখন আর আমার মধ্যে নেই। এখন আমি নিশ্চিত স্থাপত্যবিদ্যার বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই। সে নিশ্চয়ই তার মাজেদা খালার কাছ থেকে আমার কথা শুনেছে। শোনার কথা কারণ এই বুদ্ধিহীনা রমণীর স্বভাব হচ্ছে বকরবকর করা। মহিলা আগ বাড়িয়ে অবশ্যই হিমুকে নানান গল্প করেছেন। হিমু ইন্টারনেট ঘেঁটে কিছু তথ্য জেনে এসেছে আমাকে চমকে দেওয়ার জন্যে। ইন্টারনেটের কল্যাণে মূর্খরাও এখন সবজান্তার মতো কথা বলে।

সে মাজারের খাদেমের সেবায়েত—এই তথ্যও আমাকে দিয়েছে চমকানোর জন্যে। সে আমাকে মাজারের একটা ডিজাইন করতে বলবে—এটা আগেই ঠিক করে রেখেছে। আমি কিছুটা হলেও তার ফাঁদে পড়েছি। কারণ সে মাজারে চাকরি করে এটা বিশ্বাস করেছি। বোকা মেয়েরা এইভাবে ফাঁদে পড়ে এবং একসময় ফাঁদ থেকে বের হতে পারে না।

আমার কলেজ জীবনের এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী শর্মিলা এমন একজনের ফাঁদে পড়েছিল। যিনি ফাঁদ পেতেছিলেন, তিনি আমাদের অংক স্যার জহির খন্দকার। জহির খন্দকার সুপুরুষ ছিলেন না কিন্তু সুকথক ছিলেন। অংক ভালো শেখাতেন। অংকের সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প করতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ির পুকুরে নাকি একটা মাছ আছে, সেই মাছের মুখ দেখতে অবিকল মানুষের মতো। স্যার বললেন, তোমরা কেউ দেখতে আগ্রহী হলে আমার সঙ্গে যেতে পারো। আমরা সবাই বললাম, স্যার দেখতে চাই দেখতে চাই। মুখে বলা পর্যন্তই, স্যারের বাড়ি বরিশালের এক গ্রামে। সেখানে গিয়ে মানুষের মতো মাছ দেখার প্রশ্ন ওঠে না।

শর্মিলা আলাদাভাবে স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করল এবং কাউকে কিছু না জানিয়ে মানুষের মতো মাছ দেখতে গেল। সে সাত-আট দিন স্যারের সঙ্গে থেকে ফিরে এল, তারপর পরই ইন্টারনেটে তার যৌনকর্মের ভিডিও চলে এল। ভিডিওতে তার পুরুষসঙ্গী যে জহির স্যার তা বোঝা যায় না। কারণ পুরুষসঙ্গী সচেতনভাবেই অন্ধকারে নিজের চেহারা আড়াল করেছিল।

শর্মিলা দুই ফাইল ডরমিকাম খেয়ে আত্মহত্যা করে। দুই ফাইলের কথা আমি জানি কারণ ডরমিকাম কেনার সময় আমি তার সঙ্গে ছিলাম। রাতে ঘুম হয় না বলে এতগুলো ডরমিকাম সে কিনেছিল। স্যারের সঙ্গে তার কী কী হয়েছিল শর্মিলা সবই আমাকে জানিয়েছিল। স্যারের এক বন্ধুও যুক্ত ছিল। সেই বন্ধুর চোখ কটা এবং থুতনিতে একটা দাগ। বন্ধুর নাম পরিমল এবং তার বন্ধু পরিমল নিশ্চয়ই আরও অনেক বেকুব মেয়েকে মানুষের মতো দেখতে সেই অদ্ভুত মাছ দেখিয়েছেন। তিনি একটা কোচিং সেন্টারও শুরু করেছেন। কোচিং সেন্টারের নাম 'ম্যাথ হাউজ'। ম্যাথ হাউজে মেয়ের সংখ্যাই বেশি। স্যারের জন্যে সুবিধাই হয়েছে।

কোচিং সেন্টারে আমি একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করলেন। শর্মিলার মৃত্যুসংবাদ শুনে ব্যথিত গলায় বললেন, আহারে কীভাবে মারা গেল! ঘুমের ওষুধ খেয়ে মারা গেছে শুনে তিনি হতাশ গলায় বললেন, মেয়েগুলো এত বোকা কেন ? মৃত্যু কোনো সলিউশন হলো! লাইফকে ফেস করতে হয়।

আমি বললাম, স্যার শর্মিলার খুব ইচ্ছা ছিল আপনার গ্রামের বাড়ির পুকুরের মাছটা দেখতে, যেটার মুখ দেখতে মানুষের মতো।

স্যার বললেন, এই শখ ছিল জানতাম না তো। জানলে নিয়ে যেতাম।

আমি বললাম, আমাকে কি নিয়ে যাবেন স্যার ? আমারও খুব শখ।

স্যার বললেন, সত্যি যেতে চাও ?

আমি বললাম, অবশ্যই। তবে গোপনে যাব স্যার। জানাজানি যেন না হয়। আমাদের দেশের মানুষ তো খারাপ, আপনার সঙ্গে যাচ্ছি তারপরেও নানান কথা উঠবে।

স্যার বললেন, তোমার টেলিফোন নাম্বার রেখে যাও, ব্যবস্থা করতে পারলে খবর দিব। কোচিং সেন্টার নিয়ে এমন ঝামেলায় আছি, সময় বের করাই সমস্যা।

কষ্ট করে একটু সময় বের করবেন স্যার প্লিজ।

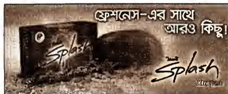
স্যার বললেন, একটা কাজ করা যায়, এখন বাই রোডে বরিশাল যাওয়া যায়। একটা রিকন্ডিশন্ড গাড়ি কিনেছি, সকাল সকাল রওনা দিলে রাত আটটা সাড়ে আটটার দিকে পৌছে যাব। এক রাত থেকে পরদিন চলে এলাম, ঠিক আছে ? ওই বাড়িতে আমার মা থাকেন। তুমি রাতে মা'র সঙ্গে ঘুমালে।

আমি বললাম, এক রাত কেন! আমি কয়েক রাত থাকব। কত দিন গ্রামে যাই না।

স্যার বললেন, তোমরা শহরের মেয়েরা গ্রাম থেকে দূরে সরে গেছ এটা একটা আফসোস। গ্রামে যেতে হয়। ফার ফ্রম দ্যা মেডিং ক্রাউড। আমার এক বন্ধু আছে, নাম পরিমল। একটা কোচিং সেন্টারে বাংলা পড়ায়। পনেরো দিনে একবার সে গ্রামে যাবেই।

আমি বললাম, হাউ সুইট!

স্যার বললেন, পরিমল ট্যালেন্টেড ছেলে। বাংলা একাডেমী থেকে তার বই বের হচ্ছে—বাংলার ঐতিহ্য সিরিজের বই। একটার কম্পোজ চলছে, সে প্রুফ দেখছে। আরেকটার পাণ্ডুলিপি জমা পড়েছে।



বলেন কী স্যার!

তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। কথা বললে তোমার ভালো লাগবে। তার মাথায় নতুন আইডিয়া এসেছে—ঢাকার মাজার। এই নিয়ে বই লিখছে। তার ইচ্ছা



মুনতাসির মামুন সহেবের সঙ্গে কলাবরশনে বইটা করে। মামুন সাহেব রাজি হচ্ছেন না।

রাজি হচ্ছেন না কেন ?

নিজেকে বিরাট ইন্টেলেকচুয়েল ভাবেন তো, এইজন্যে রাজি হচ্ছেন না। ঢাকার মাজার সম্পর্কে তুমি যদি কিছু জানো তা হলে পরিমলকে জানিয়ো, সে খুশি হবে। কৃতজ্ঞতায় তোমার নামও বইয়ে চলে যাবে।

জি আচ্ছা স্যার। যাই ?

যাও। খুব ভালো লাগল তোমার সঙ্গে কথা বলে। খুব শিগগিরই একটা তারিখ করব। আমি, তুমি আর পরিমল।

স্যার কয়েকবার তারিখ ফেলেছেন, আমি নানা অজুহাত দেখিয়ে পাশ কাটিয়েছি। তবে আমি যাব—শয়তানটাকে শিক্ষা দিব। আমার বিশেষ পরিকল্পনা আছে। আচ্ছা হিমুটাকে কি সঙ্গী করা যায় ? পরিকল্পনা আমার, সেটি বাস্তব করবে সে।

শুধু শয়তানটাকে না, আমার সব পুরুষ মানুষকেই শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করে। কারণ সব পুরুষের ভেতরই শয়তান থাকে। ছোট শয়তান, মাঝারি শয়তান, বড় শয়তান। চেহারা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। যে যত বড় শয়তান, তার চেহারা ততটাই 'ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারি না' টাইপ। মেয়েদের প্রতি মনোভাব একজন রিকশাওয়ালার যা, জহির খন্দকারেরও তা, হার্ভার্ডের ফিজিক্সের পিএইচডিরও তা। পদার্থবিদ্যার মাথা স্বয়ং আইনস্টাইনের একটি জারজ মেয়ে ছিল। মেয়ের নাম লিসারেল, তার মা'র নাম ম্যারিক।

যেখানে স্বয়ং আইনস্টাইনের এই অবস্থা, সেখানে হার্ভার্ডের পিএইচডি কী হবে বোঝাই যায়।

এই পিএইচডিওয়ালার সঙ্গে আমার দেখা হয় আমার মায়ের স্কুলজীবনের বন্ধু মাজেদা খালার বাসায়। পিএইচডিওয়ালার চেহারা 'ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারি না' টাইপ। তিনি আমাকে বললেন, খুকি, তোমার নাম কী ?

তরুণী মেয়েকে বয়স্করা ইচ্ছা করে খুকি ডাকে। খুশি করার চেষ্টা। আমি বললাম, তুতুরি।

তিনি চোখ বড় বড় করে কয়েকবার বললেন, তুতুরি! তুতুরি! নাম নিয়ে বাজনা বাজালেন।

তারপর বললেন, নামের অর্থ কী ?

আমি বললাম, অর্থ জানি না।

আমি তাকে মিথ্যা কথা বললাম। নামের অর্থ কেন জানব না ? অর্থ অবশ্যই

জানি।

• তুতুরি আমার দেওয়া নাম। ডিকশনারি দেখে বের করেছি। এর অর্থ সাপুড়ের বাঁশি। বাঁশি বাজলেই সাপ ফণা তুলে নাচবে। সাপ নাচাতে আমার ভালো লাগে।

পিএইচডিওয়ালা আমি নামের অর্থ জানি না শুনে বিচলিত হয়ে গেলেন বলে মনে হলো। তিনি বললেন, যিনি নাম রেখেছেন তিনি নিশ্চয়ই জানেন। তোমার বাবা কিংবা মা।

আমি বললাম, তারা দুজনই মারা গেছেন, আমার বয়স যখন চার তখন। তাদের নামের অর্থ জিজ্ঞেস করা হয় নি।

উনি আরও বিচলিত হলেন এবং বললেন, আমি নামের অর্থ বের করার চেষ্টা করব। তুমি আমার হোটেলের নাম্বারে টেলিফোন করে জেনে নিয়ো।

এইবার থলের বিড়াল বের হতে শুরু করেছে। 'হোটেলে টেলিফোন করে জেনে নিয়ো' দিয়ে থলের মুখ খোলা হলো। এরপর বলবে, হোটেলে চলে এসো, গল্প করব।

আমি একদিন পরই হোটেলে টেলিফোন করে বললাম, আমি তুতুরি। তিনি বললেন, তুতুরি কে?

এটা এক ধরনের খেলা। ভাবটা এরকম যেন নামও ভুলে গেছি।

আমি বললাম, আপনার সঙ্গে মিসেস মাজেদার বাসায় দেখা হয়েছিল। আপনি আমার নামের অর্থ জানতে চাইলেন, অর্থ বলতে পারলাম না।

ও আচ্ছা আচ্ছা। তুমি হলে ডিজাইনে গোল্ড মেডেল পাওয়া আর্কিটেক্ট। আমি তোমার নামে অর্থ বের করেছি। অর্থ হলো সাপুড়ের বাঁশি।

আমি বললাম, কী ভয়ঙ্কর!

উনি বললেন, ভয়ঙ্কর কিছু না। সুন্দর নাম। তোমার নাম থেকে আমি একটা আইডিয়া পেয়েছি, এটা শুনলে তোমার ভালো লাগবে। শুনতে চাও?

আমি উৎসাহে চিড়বিড় করছি এমন ভঙ্গিতে বললাম, অবশ্যই শুনতে চাই স্যার। (আমার নাম থেকে আইডিয়া পেয়েছে। বিরাট আইডিয়াবাজ চলে এসেছেন। আইডিয়া তো একটাই—মেয়ে পটানো আইডিয়া।)

উনি বললেন, তুতুরির সঙ্গে মিল রেখে নতুন একটা শব্দ মাথায় এল। ফুতুরি। আমি ভাবলাম শব্দটা বাংলা ভাষায় ঢুকিয়ে দিলে কেমন হয়। ফুতুরি হবে ফুঁ দিয়ে বাজানো হয় এমন সব বাদ্যযন্ত্রের 'কমন নেম'। আমি বাংলা একাডেমীর ডিজিকে এই বিষয়ে একটি চিঠি লিখলাম।

আমি অবাক হওয়ার মতো করে বললাম, ডিজি স্যাহেব কি চিঠির জবাব দিয়েছেন?

না। তবে উনি টেলিফোন করেছিলেন। উনি বলেছেন নতুন এই শব্দটা কাউন্সিল মিটিংয়ে তোলা হবে। কাউন্সিল পাশ করলে বাংলা ভাষায় একটা নতুন শব্দ যুক্ত হবে।

আমি আনন্দে লাফাচ্ছি এমন ভঙ্গি করে বললাম, স্যার বলেন কী, বাংলা ভাষায় আপনার একটা শব্দ চলে আসছে! মনে মনে বললাম, আষাঢ়ে গল্প বলার জায়গা পাও নি? বাংলা একাডেমীর ডিজি শিশি খান? তুমি নতুন শব্দ দেবে আর বাংলা একাডেমীর ডিজি তা নিয়ে নিবেন। তা হলে আমি বাদ যাব কেন? আমি একটা শব্দ দেই 'বুতুরি'। বুতুরি হলো বদপুরুষ।

বাসায় ফেরার পথে ভাবলাম মাজেদা নামের বোকা মহিলার অবস্থাটা দেখে যাই, সে কি এখনো হাগুর উপর দাঁড়িয়ে আছে? থাকলেই ভালো হয়, উচিত শিক্ষা। এই মহিলার কারণে তার স্বামী আমাকে পেত্নী বলার স্পর্ধা দেখিয়েছে, বাঁশগাছে ঝুলে বসে থাকতে বলেছে। মাজেদা নামের এই মহিলার উচিত সারা জীবন হাগুর উপর দাঁড়িয়ে থাকা।

মাজেদা বেগম

আমি অনেক বদ ছেলে দেখেছি, হিমুর মতো বদ এখনো দেখি নাই। ভবিষ্যতে কোনোদিন দেখব তাও মনে হয় না। আরে তুই দেখেছিস আমি হাগুর উপর দাঁড়িয়ে আছি। সাবান-পানি আনতে গিয়ে উধাও হয়ে গেলি? মেয়েটা তার সঙ্গে গেছে, আমি নিশ্চিত এখন হিমুর পিছনে পিছনে মেয়ে ঘুরছে। হিমু তাকে জাদু করে ফেলেছে।

হিমুর কাজই হলো জাদু করা। আমাকেও জাদু করেছে। জাদু না করলে তাকে আমি প্রশ্রয় দেই? রাজ্যের ধুলাবালি মেখে পথে পথে হাঁটে। এই নোংরা পা নিয়ে আমার ঘরে ঢোকে। আমি তো কখনো বলি না, যা বাথরুম থেকে পা ধুয়ে আয়। বরং বলি নাশতা খেয়ে এসেছিস? যা খাবার টেবিলে বোস। কী খাবি বল। দুধ-কলা দিয়ে পুষলেও কালসাপ কালসাপই থাকে।

আচ্ছা, বাংলাদেশের মানুষদের কি কাজকর্ম নাই? তোরা আমার চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? একজন নোংরার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে—এটা দেখার কিছু আছে? তোরা কি জীবনে হাগু দেখস নাই? প্রতিদিনই তো বাথরুমে যাস। নিজের হাগু দেখস না? ঠিক আছে দাঁড়িয়ে আছিস দাঁড়িয়ে থাক। চুপচাপ থাক। নানান রঙের কথা বলার দরকার কী? একজন চোখ-মুখ শুকনা করে পাশের জনকে বলল, 'খালাম্মা! কাঁচাগু'র উপরে খাড়ায়া আছেন।' আরে বদের বাচ্চা, কাঁচা গু পাকা গু আবার কী? থাপড়ানো দরকার।

আমি দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। হিমুর দেখা নাই, তুতুরিরও দেখা নাই। আমি এখন কী করব? শরীর উল্টিয়ে বমি আসছে। বমি করলে আমার চারপাশের পাবলিকের সুবিধা হয়। তারা মজা পায়। বাংলাদেশের মানুষদের মজার খুব অভাব।

যখন বুঝলাম বদ হিমু ফিরবে না, তখন লজ্জা-অপমান ভুলে নিজের এপার্টমেন্টে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। গোপনে বাথরুমে ঢুকব। গোপনে বের হয়ে আসব। মনে মনে বলছি, হে আল্লাহপাক মানুষটার সঙ্গে যেন দেখা না হয়। দরজা যেন খোলা পাই। যদি দেখি দরজা খোলা, যদি মানুষটার সঙ্গে দেখা না করে বের হয়ে আসতে পারি তা হলে একটা মুরগি ছদগা দিব। তিনজন ফকির খাওয়াব।

দরজা খোলা ছিল, ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে দেখি মানুষটা ইজিচেয়ারে কাত হয়ে আছে। গড়গড় শব্দ হচ্ছে। হার্ট অ্যাটাক না-কি? আমি বললাম, তোমার কী হয়েছে? সে জবাব দিতে পারল না, গোঙানির মতো শব্দ করল। তার সারা শরীর ঘামে ভেজা। মাথায় হাত দিয়ে দেখি মাথা বরফের মতো ঠান্ডা।

আমি তাকে কীভাবে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম তা বলতে পারব না। মহাবিপদের সময় সব এলোমেলো হয়ে যায়। মোবাইল ফোন খুঁজে পাওয়া যায় না, হাসপাতালের টেলিফোন নাম্বার যে খাতায় লেখা সেই খাতা খুঁজে পাওয়া যায় না, ঘরে তখনই শুধু ক্যাশ টাকা থাকে না, ড্রাইভার বাসায় থাকে না আর থাকলেও গাড়ি স্টার্ট নেয় না। গাড়ির চাবি লক হয়ে যায়।

হাসপাতালে ডাক্তাররা যমে মানুষে টানাটানির মতোই করল। নতুন নতুন ওষুধপত্র বের হওয়ায় যমের শক্তি কমে গেছে। এক সময় ডাক্তার বলল, মনে হয় বিপদ কেটে গেছে। ম্যাসিভ হার্টঅ্যাটাক হয়ে গেছে। আর দশ মিনিট দেরি হলে রোগী বাঁচানো দুঃসাধ্য ছিল। আপনার হাজব্যান্ড ভাগ্যবান মানুষ।

হঠাৎ মনে হলো, হিমু সাবান-পানি নিয়ে আসে নাই বলে মানুষটা বেঁচে গেল। হিমু কি কাজটা জেনে শুনে করেছে? ফুটপাতে কাঁচা গুয়ে পাড়া না পড়লে আমি চলে যেতাম। মানুষটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে মরে পড়ে থাকত। মানুষটার বেঁচে থাকার পেছনে ফুটপাতের হাগুরও বিরাট ভূমিকা। এই দুনিয়ার অদ্ভুত হিসাব-নিকাশ। কী থেকে কী হয় কে জানে।

আমি সিসিইউ-র সামনের বেঞ্চিতে বসা। রাত তিনটার উপর বাজে। ডাক্তার এসে বলল, আপনার হাসবেন্ডের জ্ঞান ফিরেছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছে।

আমি মানুষটার দিকে তাকিয়ে আছি। মানুষটা এমন অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে। কী যে মায়া লাগছে! সে ক্ষীণ গলায় বলল, মাজেদা ভালো আছ ?

আমি বললাম, আমি যে ভালো আছি তা তো দেখতেই পারছ। তুমি কেমন আছ ?

সে বলল, বুকের ব্যথাটা নাই।

আমি বললাম, কথা বলতে হবে না। চোখ বন্ধ করে ঘুমাও।

সে বলল, মরে টরে যদি যাই, একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। তুমি এটা জানো না। যে অ্যাপার্টমেন্টে আমরা থাকি সেটা তোমার নামে কেনা। উত্তরাতে আমার আরেকটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে। সেটাও তোমার নামে কেনা। তোমাকে বলা হয় নাই, সরি।

এখন চুপ করো তো। শুনলাম।

সে বলল, তোমার এপার্টমেন্টে দেয়াল টেয়াল ভেঙে কী করতে চাও করবে। আমার বলার কিছু নাই। এ মেয়ে তুতুরি না কী যেন নাম তাকে কাজ শুরু করতে বলো।

তোমার শরীর কি এখন যথেষ্ট ভালো বোধ হচ্ছে ?

হুঁ। শুধু স্মেল সেন্সে সমস্যা হয়েছে। তুমি যে সেন্ট মাখো তার গন্ধ পাচ্ছি না। তোমার গা থেকে কঠিন গুয়ের গন্ধ পাচ্ছি।

মানুষটার কথা শুনে মনে পড়ল, আমি নোংরা পায়েই ছোটাছুটি করছি। এখন পর্যন্ত পা ধোয়া হয় নি।

৫

বল্টু স্যারের ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। ভেতরে কী হচ্ছে বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখা যায়। আমি উঁকি দিতেই বল্টু স্যার বললেন, হিমু, প্লিজ গেট ইন। স্যার যেভাবে বসে আছেন, আমাকে তাঁর দেখার কথা না। তাঁর সামনে আয়নাও নেই যে আয়নায় আমাকে দেখবেন। সব মানুষই কিছু রহস্য নিয়ে জন্মায়।

আমি ঘরে ঢুকতেই স্যার বললেন, গত রাতে ভয়ঙ্কর এক ঝামেলা গেছে। কী হয়েছে মন দিয়ে শোনো। ঘুমুতে গেছি রাত দশটা একুশ মিনিটে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম আমি ইলেকট্রন হয়ে গেছি।

ইলেকট্রন হয়ে নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন ?

অনেকটা সে রকম। তবে আমি কণা হিসেবে ছিলাম না। তরঙ্গ হিসেবে ছিলাম।

ইলেকট্রন হওয়ার পর আপনার ঘুম ভাঙল ?

না, আমি সারা রাত ইলেকট্রন হিসেবেই ছিলাম। এখানে-ওখানে ছোটাছুটি করেছি। বর্ণনা করার বাইরের অবস্থা।

ব্রেকফাস্ট করেছেন স্যার ?

এক মগ ব্ল্যাক কফি খেয়েছি। ঘুম ভাঙার পর থেকে আমি চিন্তায় অস্থির। ব্রেকফাস্ট করব কী ?

আমি বললাম, যে যে লাইনে থাকে তার স্বপ্নগুলি সেই লাইনেই হয়। মাছ যে বিক্রি করে, তার বেশির ভাগ স্বপ্ন হয় মাছ নিয়ে। রুই মাছ, পুঁটি মাছ, বোয়াল মাছ। আপনি ইলেকট্রন প্রোটন নিয়ে আছেন, এইজন্য ইলেকট্রন প্রোটন স্বপ্ন দেখছেন।

বোকার মতো কথা বলবে না হিমু। আমি ইলেকট্রন প্রোটন স্বপ্ন দেখছি না। আমি ইলেকট্রন হয়ে যাচ্ছি। মাছওয়ালা কখনোই স্বপ্ন দেখে না সে একটা বোয়াল মাছ হয়ে গেছে। বলো সে দেখে ?

সেই সম্ভাবনা অবশ্যি কম।

ইলেকট্রন হয়ে যাওয়া যে কী ভয়াবহ তা তুমি বুঝতেই পারছ না। চিন্তা করতে পারো আমি একটা ওয়েভ ফাংশান হয়ে গেছি! ওয়েভ ফাংশান কী জানো ?

জি-না স্যার।

কাগজ কলম আনো, চেষ্টা করে দেখি তোমাকে বোঝাতে পারি কি না।

জটিল অংক আমার মাথায় ঢুকবে না স্যার।

বোকার মতো কথা বলবে না। অংক মোটেই জটিল কিছু না। অংক খুবই সহজ। অংকের পেছনের কিছু ধারণা জটিল।

পরবর্তী আধা ঘণ্টা আমি অনেক রকম অংক দেখলাম। স্যার খাতায় অনেক আঁকিবুকি করে এক সময় নিজের অংকে নিজেই অবাক হয়ে বললেন, এটা কী ?

আমি বললাম, কোনটা কী ?

স্যার জবাব দিলেন না। নিজের অংকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। তিনি এতক্ষণ আমাকে অংক বোঝাচ্ছিলেন না। নিজেকেই বোঝাচ্ছিলেন। আমি বললাম, স্যার আপনার মাথার গিট্টু আন্ধা গিট্টুর রূপ নিচ্ছে। চলুন গিট্টু ছুটানোর ব্যবস্থা করি। কেরামত চাচার কাছে যাবেন ?

স্যার লেখা থেকে চোখ না তুলে বললেন, কার কাছে যাব ?

কেরামত চাচার কাছে। উনি হাসি-তামাশা করে আপনার মাথার গিট্টু ছুটিয়ে দিবেন।

স্যার বললেন, আমি একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি। এখন আমাকে বিরক্ত করবে না।

জি আচ্ছা স্যার।

চুপ করে বসে থাকো, নড়বে না।

আমি চুপ করে বসে আছি। স্যারের হাতে কলম। তিনি কলম দিয়ে কিছু লিখতে যাচ্ছেন আবার না লিখে কলম হাতে সরে আসছেন। আমি মোটামুটি মুগ্ধ হয়েই তার কলম ওঠানামা দেখছি।

হিমু, তুমি অধ্যাপক ফাইনম্যানের নাম শুনেছ ?

জি-না স্যার।

তিনি ইলেকট্রন নিয়ে ডিরাক (Dirac)-এর মূল কাজ পরীক্ষা করতে গিয়ে অদ্ভুত একটা বিষয় দেখতে পান। তিনি ডিরাকের সমীকরণে সময়ের প্রবাহ উল্টা করে দেখলেন, সমীকরণ যে রূপ নেয় ইলেকট্রনের চার্জ উল্টে দিলেও একই রূপ নেয়। অদ্ভুত না ?

আপনি যখন বলছেন তখন অবশ্যই অদ্ভুত।

আমি বলব কেন! ফাইনম্যান নিজেই বলেছেন, অদ্ভুত।

জি জি বুঝতে পারছি।

কেন অদ্ভুত সেটা বুঝতে পারছ ?

জি-না স্যার।

অদ্ভুত, কারণ এই সমীকরণের সমাধান বলছে ইলেকট্রন সময়ের উল্টোদিকে চলে যাচ্ছে।

স্যার বলেন কী ?

তুমি 'স্যার বলেন কী' বলে যেভাবে চিৎকার করলে, তা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারছি তুমি কিছুই বুঝতে পারো নি। অবশ্যি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। অ্যাবস্ট্রাক্ট বিষয় বোঝা যায় না। তুমি কি আমার একটা উপকার করবে ?

অবশ্যই করব।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। তুতুরি নামের একটা মেয়ের কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার এখানে আসার কথা। সে

যেন আসতে না পারে।

আমি বললাম, দরজা বন্ধ করে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেই—Dont Disturb.

আমার ক্লস্টোফোবিয়া আছে। সব সময় দরজা-জানালা কিছুটা খোলা রাখি। মূল দরজা বন্ধ করা যাবে না। রুমের টেলিফোন লাইনটা কেটে দাও। জটিল সময়ে টেলিফোন বেজে উঠলে সব এলোমেলো হয়ে যাবে।

আমি দরজার বাইরে। তুতুরির অপেক্ষা করছি। দরজার ফাঁক দিয়ে স্যারের দিকেও নজর রাখছি। স্যার কলম হাতে ওঠানামা করেই যাচ্ছেন। কলম এখনো কাগজ স্পর্শ করে নি। কে জানে কখন করবে! দেখা যাবে সারা দিন ওঠানামা করে তিনি রাতে ঘুমুতে গিয়ে আবার ইলেকট্রন হয়ে যাবেন। ইলেকট্রন হয়ে সময়ের উল্টোদিকে চলে যাবেন।

তুতুরি দরজার বাইরে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুবই অবাক হলো। বল্টু স্যারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের বিষয়টা সে মনে হয় জানে না। তুতুরি বলল, আপনি এখানে কী করছেন?

আমি বললাম, যা বলার ফিসফিস করে বলুন। গলা উঁচিয়ে কথা বলা নিষেধ।

কার নিষেধ?

স্যারের নিষেধ। স্যার কাল রাতে ইলেকট্রন হয়ে গিয়েছিলেন, এখন অবশ্যি স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন। তবে কতক্ষণ স্বাভাবিক থাকেন কে জানে! হয়তো আবার ইলেকট্রন হয়ে দরজা দিয়ে বের হয়ে সময়ের বিপরীত দিকে চলে যাবেন। সময়ের বিপরীতে যাওয়া স্যারের জন্যে সুখকর না হওয়ার কথা।

তুতুরি চোখ কপালে তুলে বলল, হড়বড় করে কী বলছেন? যা বলার পরিষ্কার করে বলুন।

আমি বললাম, বিজ্ঞানের জটিল কথা তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারব না। চলুন কোথাও বসে চা খেতে খেতে বলি। এক হাজার টাকার নোট কি আপনার কাছে আরও আছে?

তুতুরি বেশ কিছু সময় আমার চোখে চোখ রেখে এক সময় বলল, আছে।

আমি এবং তুতুরি রাস্তার পাশের চায়ের দোকানের সামনে। আমাদের একটা টুল দেওয়া হয়েছে। টুলটা লম্বায় খাটো। দুজনের বসতে সমস্যা হচ্ছে। গায়ের সঙ্গে গা লেগে যাচ্ছে। তুতুরির অস্বস্তি দেখে আমি চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। তুতুরির দিকে তাকিয়ে বললাম, আরাম করে বসো।

তুতুরি বলল, আপনি আবার তুমি বলা শুরু করেছেন।

আমি বললাম, সরি। আপনি-চক্র ভুলে গিয়েছিলাম। আর ভুল হবে না।

তুতুরি বলল, আপনি কি আপনার মাজেদা খালার খোঁজ নিয়েছিলেন?

না।

খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল না?

উচিত ছিল।

উচিত কাজটি করেন নি কেন?

খালা খালু সুখে আছেন এইজন্যে খোঁজাখুজি বাদ দিয়েছি।

তারা সুখে আছেন এটাইবা জানেন কীভাবে?

আমি নির্বোধের হাসি হাসলাম। নির্বোধ হাসি প্রশ্নবান ঠেকাতে পারে, বর্মের মতো কাজ করে।

তুতুরি বলল, বোকার মতো হাসবেন না। আপনার খালুর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল।



গুড!

গুড কেন?

হার্ট অ্যাটাক হওয়ার আগ পর্যন্ত মানুষ বুঝতে পারে না হার্ট নামে তার শরীরে একটা যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রটা জন্মের আগে থেকে কাজ করতে শুরু করে। এক সময় হতাশ হয়ে কাজ বন্ধ করে। তখন ফটাস অর্থাৎ খেল খতম পয়সা হজম।

তুতুরি বলল, আমি আপনার বিষয়ে মাজেদা খালার কাছে জানতে চেয়েছিলাম।

কী বলেছেন?

আপনার খালার ধারণা আপনি অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন।

ভুঁয়া কথা।

তুতুরি বলল, আমি জানি ভুঁয়া কথা। মানুষ কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে আসে না। দুষ্টুমি করার ক্ষমতা নিয়ে আসে। কুকর্ম করার ক্ষমতা নিয়ে আসে। আপনি নিশ্চয়ই অনেক কুকর্ম করেছেন।

আমি বললাম, এখনো করি নি, তবে করব। একজনকে জন্মের শিক্ষা দেব, সেটা তো কুকর্মের মতোই।

কাকে শিক্ষা দেবেন?

আপনার পরিচিত একজনকে।

তুতুরি অবাক হয়ে বলল, সে কে?

এখনো বুঝতে পারছি না সে কে। ভাসা ভাসা ভাবে মনে হচ্ছে সে তোমার অংকের শিক্ষক। সরি তুমি বলে ফেলেছি।

তুতুরি বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল, আমার এই শিক্ষকের কথা আপনাকে কে বলেছে? নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ বলেছে। আপনি অলৌকিক ক্ষমতায় বিষয়টা জেনেছেন—এটা আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না।

আমি বললাম, খামাখা কেন বিশ্বাস করবে? পৃথিবী অবিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম বাসস্থান। তুমি বরং এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দাও হুজুরের জন্য, নিয়ে চলে যাই।

তুতুরি বলল, সিগারেট আমি আপনাকে কিনে দিচ্ছি, তার আগে প্লিজ বলুন কোত্থেকে জেনেছেন? কে বলেছে আপনাকে?

তুমি বলেছ।

আমি কখন বললাম?

মনে মনে বলেছ। আমি মনে মনে বলা কথা হঠাৎ হঠাৎ বুঝতে পারি। এই মুহূর্তে আমি মনে মনে কী বলছি বলুন।

তুমি মনে মনে বলছ, হিমু নামের মানুষটা ভয়ঙ্কর এক শয়তান। এর কাছ থেকে সব সময় এক শ' হাত দূরে থাকতে হবে। তুমি এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দাও, আমি এক শ' হাত দূরে চলে যাচ্ছি।

হুজুরের সামনে সিগারেটের প্যাকেট রাখতেই হুজুর বললেন, অজু করে ফেলো। আছরের নামাজের ওয়াক্ত হয়েছে। অজুর নিয়মকানুন জানো তো? কঠিন নিয়ম। উনিশ-বিশ হলে কিন্তু নামাজ হবে না। আমাকে দেখো, পা নাই তারপরেও অজুর সময় পা যেখানে ছিল সেই জায়গা ধুই। পায়ের আঙুলের ফাঁকে পানি দেই।

আমি বললাম, হুজুর! দুপুরে কিছু খেয়েছেন?

হুজুর বললেন, না। খাওয়া খাদ্যের সমস্যা হচ্ছে। এইজন্যে সকালে নিয়ত করে রোজা রেখে ফেলেছি। খাওয়াদাওয়ার সমস্যা কিছু কমল আবার সোয়াবের খাতায় জমা পড়ল। কাজটা ভালো করেছি না?

অবশ্যই ভালো করেছেন। সিগারেট

ধরাচ্ছেন কেন? রোজা নষ্ট হবে না?

ধোঁয়াজাতীয় কিছুতে রোজা নষ্ট হয় না। গাড়ির ধোঁয়া নাকে গেলে রোজা নষ্ট হয় না। ফুলের গন্ধ নাকে গেলেও রোজা নষ্ট হয় না।

এই জাতীয় কোনো মসালা কি আছে?

এটা আমার মাসালা। চিন্তাভাবনা করে বের করেছি। এখন বাবা যাও, এক কাপ চা এনে দাও।

চা খেলে রোজা ভাঙবে না?

চায়ের গন্ধটা নাকে নিব। চায়ের গন্ধের সঙ্গে সিগারেট খাব। আরেকটা মাসালা শোনো, তৃপ্তির সাথে কিছু খেলেও রোজার সোয়াব লেখা হয়।

আপনি তো হুজুর প্রচুর সোয়াব জমা করে ফেলেছেন।

হুজুর বললেন, তা করেছি। একজীবনে একটা বড় সোয়াব করাই যথেষ্ট। ব্যাংকে টাকা যেমন বাড়ে, আল্লাহর ব্যাংকে সোয়াবও বাড়ে। লাইলাতুল কদরে আল্লাহপাক সব জমা সোয়াব ডাবল করে দেয়। বিরাট সোয়াব একটা করেছি যৌবন বয়সে।

কী সোয়াব?

এটা বলা যাবে না। সোয়াবের গল্প করলে আল্লাহপাক সঙ্গে সঙ্গে সোয়াব অর্ধেক করে দেন। দুইজনের সঙ্গে গল্প করলে সোয়াব অবশিষ্ট থাকে চাইরের এক অংশ। তিনজনের সঙ্গে গল্প করলে থাকে মাত্র আটের এক অংশ।

আপনি কারও কাছেই কী সোয়াব করেছেন এটা বলেন নাই?

নাহ্। সোয়াব যতটুকু করেছি, সবটা আল্লাহপাকের দরবারে জমা আছে। প্রতি বছর বাড়তেছে। যাও বাবা, চা-টা নিয়ে আসো, তৃপ্তি করে সিগারেট খেয়ে আরেকটা সোয়াব হাসিল করি। যা করে তৃপ্তি পাওয়া যায়, তাতেই সোয়াব।

খাদেম পীর বাচ্চাবাবার মাজার

হিমু অজু করছে। অজু করা দেখে মনটা খারাপ হয়েছে। অনেক ভুলভ্রান্তি। ডান পা আগে ধুবে তারপর বাম পা। সে করেছে উল্টা। তিনবার কুলি করার জায়গায় সে করেছে চারবার। হাতের কনুই পর্যন্ত অজুর পানি পৌঁছেছে বলে মনে হয় না। এইসব বরখেলাফ আল্লাহপাক পছন্দ করেন না। হিমুকে ধরে ধরে সব শিখাতে হবে। সে ছেলে ভালো। আদব-কায়দা জানে। আমার প্রতি তার আলাদা নজর আছে। রোজা রেখেছি শুনেই আমার মোবাইল নিয়ে কাকে যেন বলল, হুজুর রোজা রেখেছেন। হুজুরের জন্যে ইফতার আর খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

হিমু টেলিফোন ফেরত দিয়ে বলল, হুজুর ভালো খাবারের ব্যবস্থা করেছি। বিছমিল্লাহ হোটেলের বাবুর্চি কেরামত চাচা নিজে খানা নিয়ে আসবেন।

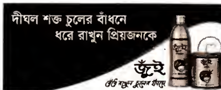
আমি বললাম, হিমু তুমি এমন এক কথা বলেছ যে আল্লাহপাক গোস্বা হয়েছে। খাবারের ব্যবস্থা তুমি করো নাই। খাবারের ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহপাক। তুমি উছিলা মাত্র। বলো আস্তাগফিরুল্লাহ।

হিমু বলল, আস্তাগফিরুল্লাহ।

বলো, সোবাহানাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আকবর।

সে ভক্তি নিয়ে বলল, সোবাহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আকবর।

আচ্ছা এখন যাও কাজকর্ম করো। সে ঝাটা নিয়ে মাজার পরিষ্কার করতে লাগল। এই ছেলের উপর আমার দিলখোশ হয়েছে। আমি তাকে গোপন কিছু জিনিস শিখিয়ে দিব। যেমন ফজরের নামাজের পর তিনবার সূরা হাসরের শেষ তিন আয়াত পড়লে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্যে দোয়া করবে। বিরাট ব্যাপার।



আমি যে সোয়াবের একটা কাজ করেছি—এটা আমি ছেলেটাকে বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ঘটনাটা হলো, অনেক বছর আগে আমি ফুটপাত দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ দেখি একটা বাচ্চা মেয়ে রাস্তা পার হচ্ছে আর তার দিকে ট্রাক আসছে। মেয়েটা ট্রাক দেখে নাই, আমি মেয়েটার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। মেয়েটা বাঁচল, ট্রাকের চাকা চলে গেল আমার পায়ের উপর দিয়ে। দু'টা পা শেষ। অবশ্যি যা হয়েছে আল্লাহপাকের হুকুমে হয়েছে। ট্রাকচালকের এখানে কোনো দোষ নাই। তার উপর আল্লাহপাকের হুকুম হয়েছে ট্রাকের চাকা আমার পায়ের উপর দিয়ে নিতে। সে নিয়েছে। তার কী দোষ?

মেয়েটার নাম জয়নাব। নবী এ করিমের স্ত্রীর নামে নাম। অনেক দিন মেয়েটার জন্যে দোয়া খায়ের করা হয় না। আগে নিয়মিত দোয়া করতাম। আবার শুরু করা প্রয়োজন। অন্যের জন্য দোয়া করলেও নেকি পাওয়া যায়।

আছর ওয়াক্তে হিমুর পরিচিত এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। মাশাল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর চেহারা। সুন্দর চেহারা আল্লাহপাকের নিয়ামত। হযরত ইউসুফ আলাহেস সালামের সুন্দর চেহারা ছিল। ভদ্রলোককে দেখে হিমুর ব্যস্ততা চোখে পড়ে মনটা ভালো হয়ে গেল। মানুষকে সম্মান এইভাবে দিতে হয়। যে অন্যকে সম্মান দেয়, আল্লাহপাক তাকে সম্মান দেয়।

হিমু বলল, স্যার এখানকার ঠিকানা কোথায় পেলেন?

ভদ্রলোক বললেন, ঠিকানা কীভাবে জোগাড় করেছি এটা জানা কি অত্যাবশ্যক?

হিমু বলল, জি-না স্যার। আপনাকে এত অস্থির লাগছে কেন?

ভদ্রলোক বললেন, দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়েছিলাম। আবারও সেই জিনিস।

ইলেকট্রন হয়ে গেলেন?

হ্যাঁ, তবে চার্জ নেগেটিভ না হয়ে পজেটিভ ছিল। অর্থাৎ আমি হয়েছি পজিট্রন। ভয়াবহ ব্যাপার!

ভয়াবহ কেন?

পজিট্রন হলো ইলেকট্রনের এন্টি ম্যাটার। পজিট্রন ইলেকট্রনের দেখা পেলেই এনিহিলেট করবে। এখন চারিদিকে ইলেকট্রনের ছড়াছড়ি। পজিট্রন হয়ে আমি ভয়ে অস্থির—কখন না ইলেকট্রনের সঙ্গে দেখা হয়! আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছ?

জি স্যার। একে সহজ বাংলায় বলে বেকায়দা অবস্থা। স্যার কোনো খাওয়াদাওয়া কি করেছেন?

না।

সকালের ব্ল্যাক কফির পর আর কিছু খান নাই?

না।

মাগরেবের ওয়াক্তে ইফতার চলে আসবে, তখন হুজুরের সঙ্গে ইফতার করবেন।

হুজুরটা কে?

পীর বাচ্চাবাবা মাজারের প্রধান খাদেম।

আমি লক্ষ করলাম হিমুর স্যার সন্দেহের দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। আমি বললাম, জনাব! আসসালামু আলায়কুম। উনি বললেন, ওয়ালাইকুম সালাম। কিছু মনে করবেন না মাজারের খাদেম হিসেবে আপনার কাজটা কী?

পীর বাচ্চাবাবার মাজার রক্ষা করাই আমার কাজ।

মাজার কীভাবে রক্ষা করেন?

আমি বললাম, আপনি যে-কোনো কারণেই হোক অস্থির হয়ে আছেন। আপনার আত্মা কষ্ট পাচ্ছে। আত্মা শান্ত হোক, তখন কথা বলব।

ভদ্রলোক বললেন, আত্মা বলে কিছু নাই।

আমি হাসলাম। এই বুরবাক কী বলে?

ভদ্রলোক চোখ-মুখ শক্ত করে বললেন, আপনি বলুন আত্মা কী ? মানুষের শরীরের কোথায় সে থাকে ?

আমি বললাম, ইফতারের পর এই বিষয়ে জনাবের সঙ্গে কথা বলব।

হিমু এই ফাঁকে আমার কানে কানে বলল, হুজুর আপনি বলেছিলেন না আত্মা গুলায়ে দিবেন। খাওয়ায়ে দেন। উনি বিরাট জ্ঞানী মানুষ। ফিজিক্সে পিএইচডি। উনাকে একটা আত্মা খাওয়ায়ে দিতে পারলে লাভ আছে।

আমি একটু চিন্তায় পড়লাম। অতিরিক্ত জ্ঞানী মানুষ নানান সমস্যা করে। কারণ তারা সমস্যায় বাস করে।

যত বই পড়ে তত তাদের মাথায় সমস্যা ঢোকে। এ রকম এক সমস্যাওয়ালা মানুষের সঙ্গে একবার আমার বাহাস হয়েছিল। সে আমাকে বলল, হুজুর রোজকেয়ামত কবে হবে ? আমি বললাম, এই জ্ঞান শুধু আল্লাহপাকের আছে। তবে আছরের ওয়াক্তে রোজ কেয়ামত হবে।

সে বলল, আছরের ওয়াক্ত তো পৃথিবীর এক জায়গায় একেক সময় হয়। বাংলাদেশে এক সময় আবার আমেরিকায় আরেক সময়, তা হলে রোজকেয়ামত একেক জায়গায় একেক সময়ে হবে ?

প্যাঁচের প্রশ্ন। আমাকে প্যাঁচে ফেলা সোজা। আমি বললাম, বাবা শোনো! রোজ কেয়ামত হবে আল্লাহপাকের ঠিক করা আছরের ওয়াক্তে।

হিমুর স্যার মনে হয় আমাকে প্যাঁচে ফেলবে। যারা প্যাঁচের মধ্যে আছে তারাই অন্যকে প্যাঁচে ফেলতে চায়। হে আল্লাহপাক, হে গাফুরুর রাহিম! তুমি মানুষকে প্যাঁচ থেকে মুক্ত করো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শরিকা লাহু, লাহুল মুলকু অ-লাহুল হামদ অ হুয়া আলা কুল্লে শাইন কাদির।

হিমু তার স্যারকে মাজার দেখাচ্ছে। তার স্যার একটু পর পর বলছেন, ইলেকট্রন। ইলেকট্রন ব্যাপারটা কী জানি না। বেশি না জানাই ভালো। কম জানার মধ্যেই মুক্তি। ছোবাহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর।

অনেক কিছুই বই পড়ে শেখা যায় না। যে কোনোদিন মিষ্টি খায় নাই, সে কি কোনো বই পড়ে বুঝতে পারবে মিষ্টির স্বাদ কী। যে কোনোদিন লাল রঙ দেখে নাই, বই পড়ে সে কি বুঝবে লাল রঙ কী ?

৬

আমরা আয়োজন করে ইফতার খেতে বসেছি। পাটি ফেলে সবাই বসেছি। হুজুরকে যখন চেয়ার থেকে নামানো হলো, বল্টু স্যার তখনই লক্ষ করলেন হুজুরের পা নেই। স্যার অবাক হয়ে বললেন, আপনার পা কোথায় ?

হুজুর বললেন, আল্লাহপাক নিয়ে গেছেন। উনি নির্ধারণ করেছেন আমার পায়ের প্রয়োজন নাই। এই কারণেই নিয়ে গেছেন।

বল্টু স্যার বললেন, আপনার অবস্থা দেখে খারাপ লাগছে তবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। আপনার পা আবার গজাবে।

জনাব কী বললেন, বুঝতে পারলাম না। আমার পা আবার গজাবে ?

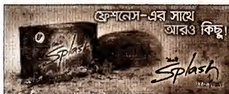
স্যার বললেন, নিম্নশ্রেণীর পোকামাকড়দের ভেঙে যাওয়া নষ্ট হওয়া প্রত্যঙ্গ আবার জন্মায়। মাকড়সার ঠ্যাং গজায়। টিকটিকির লেজ গজায়। এখন স্টেমসেল নিয়ে যে গবেষণা হচ্ছে তাতে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গজাবে।

হুজুর বিড়বিড় করে বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহ।

বল্টু স্যার প্রবল উৎসাহে বলতে লাগলেন—বিজ্ঞানের উন্নতির ধারাটা হলো এক্সপোনেনশিয়াল। এই ধারায় উন্নতির রেখা শুরুতে সরলরেখার মতো থাকে। একটা পর্যায়ে রেখায় শোল্ডার অর্থাৎ কাঁধ দেখা যায়, তারপর এই রেখা সরাসরি উঠতে থাকে। বিস্ফোরণ যাকে বলে।

হুজুর বললেন, এইসব হাবিজাবি কী বলতেছেন জনাব!

বল্টু স্যার বললেন, এক শ' ভাগ সত্যি কথা বলছি। আমরা পয়েন্ট অব সিঙ্গুলারিটির দিকে এগুচ্ছি। পৃথিবীর নানান জায়গায় সিঙ্গুলারিটি সোসাইটি হচ্ছে। এইসব সোসাইটি ধারণা করছে, দুই হাজার দুশ' সনের দিকে আমরা সিঙ্গুলারিটির দিকে পৌছে যাব। তখন আমরা অমরত্ব পেয়ে যাব। আজরাইল বেকার হয়ে যাবে।



হুজুর বললেন, জনাব, আপনি কী বলছেন আজরাইল বেকার হয়ে যাবে ?

মানুষ যদি মৃত্যু রোধ করে ফেলে, তা হলে আজরাইল তো বেকার হবেই। আজরাইলের তখন কাজ কী ?

হুজুর বললেন, ইফতারির আগে আপনি আর কোনো কথা বলবেন না। আসুন আমরা আল্লাহর নামে জিগির করি। সবাই বলেন—আল্লাহু, আল্লাহু।

সবাই বলতে আমরা তিনজন। হুজুর, আমি আর বল্টু স্যার। কেরামত চাচা টিফিন কেরিয়ার ভর্তি ইফতার রেখে চলে গেছেন। বলে গেছেন রাতে আবার আসবেন। হুজুরের নির্দেশে আমি বাংলা একাডেমীর ডিজি স্যারকে ইফতারের দাওয়াত দিয়েছি। ঠিকানা দিয়েছি। ডিজি স্যার ইংরেজিতে বলেছেন, I don't understand what you are cooking. বাংলায় হয়, তুমি কী রাঁধছ বুঝতে পারছি না। তাঁর এই উক্তিতে তিনি ইফতারে সামিল হবেন এমন বোঝা যাচ্ছে না।

ইফতারের আয়োজন চমৎকার। বিছমিল্লাহ হোটেলের বিখ্যাত মোরগপোলাও, সঙ্গে খাসির বটিকাবাব। মামের পাঁচ লিটার বোতলে এক বোতল বোরহানি।

মাগরেবের আজান হয়েছে। হুজুর আজানের দোয়া পাঠ করেছেন। আমরা ইফতার শুরু করেছি। হুজুর বললেন, যারা রোজা না তারাও যদি কখনো অতি তৃপ্তিসহকারে খাদ্য খায়, তা হলে এক রোজার সোয়াব পায়।

বল্টু স্যার বললেন, তা হলে রোজা রাখার প্রয়োজন কী ? তৃপ্তি করে ভালো ভালো খাবার খেলেই হয়।

হুজুর বললেন, যত ভালো খাদ্যই হোক আল্লাহর হুকুম ছাড়া তৃপ্তি হবে না। একবার রসুন শুকনা মরিচের বাটা দিয়ে গরম ভাত খেয়েছিলাম, এত তৃপ্তি কোনোদিন পাই নাই।

আমার মনে হয় রোজা না রেখেও আজ সবাই রোজার তৃপ্তি পেয়েছে। বল্টু স্যার বললেন, অসাধারণ। তেহারির রেসিপি নিয়ে যাব। রেসিপিতে কাজ হবে না, রান্নার প্রসিডিউর ভিডিও করে নিয়ে যেতে হবে। যেসব স্পাইস এই রান্নায় ব্যবহার হয়, সেসব আমেরিকায় পাওয়া যায় কি না কে জানে! পাওয়া না গেলে বস্তাভর্তি করে নিয়ে যেতে হবে। শুধু একটা জিনিস মিস করছি—এক বোতল রেড ওয়াইন।

হুজুর আমাকে বললেন, তোমার স্যার কিসের কথা বলছেন ?

আমি বললাম, রেড ওয়াইনের কথা বলছেন।

জিনিসটা কী ?

মদ।

আস্তাগফিরুল্লাহ! ইফতারের সময় এই শুনলাম! হে আল্লাহপাক, তুমি এই বান্দার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ো। আমিন।

বল্টু স্যার খাওয়ার পর নিমগাছের নিচে পাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যে ইলেকট্রন বা প্রোটন হয়ে গেলেন কি না তা বোঝা গেল না। তার যে তৃপ্তির ঘুম হচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে। ঘুমের সময় চোখের পাতা যদি দ্রুত কাঁপে, তা হলে বুঝতে হবে ঘুম গাঢ় হচ্ছে। চোখের পাতার দ্রুত কম্পনকে বলে, Rapid Eye Movement (REM). স্যারের REM হচ্ছে।

হুজুর বললেন, হিমু! তোমার স্যারের পায়ের কাছে একটা মশার কয়েল জ্বালায়ে দেও। উনারে মশায় কাটতেছে। মানুষের সেবা করার মধ্যে নেকি আছে।

আমি বললাম, হুজুর! মশার কি আত্মা আছে ?

হুজুর বললেন, মন দিয়া কোরান মজিদ পাঠ করো নাই, এই কারণে বোকার মতো প্রশ্ন করলা। কোরান মজিদে আল্লাহপাক বলেছেন, 'আত্মা হলো আমার

হুকুম'। তাঁর হুকুম মানুষের উপর যেমন আছে, মশামাছির উপরও আছে।

আমি বললাম, মশার কয়েল জ্বালানো তো তা হলে ঠিক হবে না। মশার আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হবে।

হুজুর বললেন, প্যাঁচের প্রশ্ন করবা না। আল্লাহপাক প্যাঁচ পছন্দ করেন না। উনার দুনিয়ায় কোনো প্যাঁচ নাই। প্যাঁচ যদি থাকত হঠাৎ দেখতা আমগাছে কাঁঠাল ফলে আছে। বর্ষাকালে বৃষ্টি নাই, শীতকালে বৃষ্টি ঝড় তুফান। নদীর মিঠা পানি হঠাৎ হয়ে যেত লোনা। আবার সাগরের পানি হয়ে যেত মিঠা। এ রকম কি হয়?

জি-না।

আমি বল্টু স্যারের পায়ের কাছে মশার কয়েল জ্বালালাম। তার মাথার নিচে বালিশ ছিল না, একটা বালিশ দিয়ে দিলাম। হুজুর বললেন, তোমার যদি বিড়ি-সিগারেট খেতে ইচ্ছা হয়, আমার দিকে পিছন ফিরে খেয়ে ফেলবা। নেশাজাতীয় খাদ্য খাওয়া ঠিক না। খাওয়ার পর পর বলবা, আস্তাগফিরুল্লাহ। এতে দোষ কাটা যাবে।

জি আচ্ছা হুজুর। শুকরিয়া।

আমার মোবাইলটা তোমারে দিয়া দিলাম। প্রায়ই এই নম্বরে তোমারে চায়। আমার টেলিফোন করার ইচ্ছা নাই। আল্লাহপাকের মোবাইল নাম্বার কি জানো?

জি-না হুজুর।

উনার মোবাইল নাম্বার হলো ২৪৪৩৪।

বলেন কী?

এই নাম্বারে মোবাইল দিলেই উনারে পাওয়া যায়। ২ হলো ফজরের দুই ফরজ নামাজ, ৪ হলো জোহরের চাইর রাকাত ফরজ নামাজ, আরেক ৪ হলো আসরের চার রাকাত, তিন হলো মাগরেবের তিন রাকাত আর এশার চার রাকাতের চার। এখন পরিষ্কার হয়েছে?

জি হুজুর।

প্রতিদিন একবার উনারে মোবাইল করবা। দেখবা সব ঠিক।

হুজুরের কাছ থেকে উপহার হিসাবে মোবাইল হাতে নেওয়ামাত্র রিং হতে লাগল।

আমি হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে তুতুরি বলল, হিমু।

আমি বললাম, গলা চিনে ফেলেছ?

তুতুরি বলল, চিনেছি। এই মুহূর্তে আপনি কী করছেন?

তোমার সঙ্গে কথা বলছি।

সেটা বুঝতে পারছি। কথা বলার আগে কী করছিলেন?

স্যারের মাথার নিচে বালিশ দিলাম। বালিশ ছাড়া ঘুমাচ্ছিলেন তো।

স্যার মানে কি পদার্থবিদ্যার পিএইচডি?

হ্যাঁ।

উনি মাজারে ঘুমাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আপনাদের ব্যাপার আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। স্যার কি সত্যিই মাজারে ঘুমাচ্ছেন?

এসে দেখে যাও।

রাতে আসব না। সন্ধ্যার পর আমি ঘর থেকে বের হই না। ভোরবেলা আসব। ততক্ষণ কি স্যার থাকবেন?

থাকার কথা।

আমি আপনাকে বিশেষ একটা কারণে টেলিফোন করেছি। আমার জন্য ছোট একটা কাজ করে দিতে পারবেন?

পারব, কী কাজ?

আপনি তো অনুমান করে অনেক কিছু বলতে পারেন। অনুমান করুন। আমি আপনার কাছে একটা জিনিস চাচ্ছি। জিনিসটার প্রথম অক্ষর 'বি'?

বিচালি চাচ্ছ? বিচালি দিয়ে কী করবে?

বিচালি আবার কী?

ধানের খড়। গরু যেটা খায়।

আপনি ইচ্ছা করে আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন। আমি বিষ চাচ্ছি। বিষ। Poison.

কী করবে? খাবে?

না আমার স্যারকে খাওয়াব। পটাসিয়াম সায়ানাইড জোগাড় করে দিতে পারবেন?

কোথায় পাওয়া যায়?

কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে পাবেন।

বাজারে যে সব বিষ পাওয়া যায় তা দিয়ে হবে না? ইঁদুর মারা বিষ, ধানের পোকার বিষ।

না। এইসব বিষের স্বাদ ভয়ঙ্কর তিতা। মুখে দেওয়ামাত্র ফেলে দেবে। সায়ানাইডের স্বাদ মিষ্টি। আমি বইয়ে পড়েছি। তারচেয়ে বড় কথা, সায়ানাইড খেয়ে মারা গেলে কারও ধরার সাধ্য নেই বিষ খেয়ে মারা গেছে।

তোমার কতটুকু লাগবে?

অল্প হলেই চলবে। মনে করুন দুই গ্রাম। দুটা গ্লাসে শরবতের সঙ্গে মিশিয়ে দুজনকে দেব। জহির স্যার আর তার বন্ধু পরিমল।

খাওয়াবে কোথায়? খাওয়ানোর পর তোমাকে দ্রুত পালিয়ে যেতে হবে।

আপনাদের মাজারে কি খাওয়ানো যায়?

কেন যাবে না? মাজারের তবারকের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে দেব। খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে থাকবে।

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি পুরো বিষয়টা ঠাট্টা হিসেবে নিয়েছেন।

তুমি যদি সিরিয়াস হও তা হলে আমি সিরিয়াস। তোমাকে মোটেই সিরিয়াস মনে হচ্ছে না।

আমি যে সিরিয়াস তার প্রমাণ দেই? সায়ানাইড আমি জোগাড় করেছি। আপনাকে বাজিয়ে দেখার জন্যে সায়ানাইড জোগাড় করতে বলেছি।

কাজ তো তুমি অনেক দূর গুছিয়ে রেখেছ। তুমি সায়ানাইড দিয়ে যাও আর দুই কালপ্রিটকে পাঠিয়ে দিয়ো।

আপনি এখনো ভাবছেন আমি ঠাট্টা করছি। সরি, আপনাকে বিরক্ত করলাম।

তুতুরি লাইন কেটে দিল।

তুতুরি

আমি সায়ানাইড কোথায় পাব? মিথ্যা করে বলেছি সায়ানাইড আছে। হিমু যেমন মিথ্যা বলছে, আমিও বলছি। সে কথায় কথায় ফাজলামি করে। আমিও কি তাই করছি?

শুনেছি প্রেমিক-প্রেমিকারা একে অন্যের স্বভাব নিজের মধ্যে ধারণ করতে চায়, যাতে তারা আরও কাছাকাছি আসতে পারে। হিমু আমার কোনো প্রেমিক নয়। তার স্বভাব কেন আমি নিজের মধ্যে নিয়ে নেব? তবে এই ঘটনা ঘটছে। আমি হিমুর মতো কিছু কথাবার্তা বলতে শুরু করেছি। উদাহরণ দেই। আমি মাজেদা খালার বাড়িতে গিয়েছি। ইন্টেরিয়রের কাজ শুরু করব এই নিয়ে কথা বলব, এস্টিমেট করব। বাসায় ঢুকে দেখি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। স্বামী-স্ত্রী পারলে একে অন্যের গলা কামড়ে ধরেন।

স্বামী এক পর্যায়ে চোখ লাল করে আঙুল উঁচিয়ে স্ত্রীকে বললেন, এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও।

স্ত্রী গলা স্বামীর চেয়েও তিনগুণ উঁচিয়ে বললেন, তুমি বের হয়ে যাও। এই অ্যাপার্টমেন্ট আমার।

কী? তোমার?

অবশ্যই আমার।

আচ্ছা তাই?

তাই করবে না। বের হয়ে যেতে বলছি, বের হয়ে যাও।

এটা তোমার শেষ কথা?

হ্যাঁ, শেষ কথা। Go to hell!

Go to hell!—বাক্যটি এই মহিলা স্বামীর কাছ থেকে শিখেছেন। প্রয়োগ করে মনে হলো খুব আনন্দ পেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসলেন। স্বামী বললেন, OK যাচ্ছি। আর ফিরব না।

স্ত্রী বললেন, ভুলেও উত্তরার অ্যাপার্টমেন্টে যাবে না। ঐটাও আমার।

স্বামী বেচারা দরজার দিকে যাচ্ছেন তখন আমি বললাম, খালি পায়ে যাবেন না। স্যান্ডেল বা জুতা পরে যান।

উনি থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে কঠিন চোখে তাকালেন। আমি তখন অবিকল হিমু যেভাবে বলত সেই ভাবে বললাম, খালি পায়ে বের হলে আপনার পায়ে হাগু লেগে যেতে পারে।

তিনি উল্কার বেগে খালি পায়ে বের হয়ে গেলেন। মাজেদা খালা বললেন, তুতুরি, কাগজ-কলম নিয়ে বসো। আমাকে বোঝাও তুমি কী কী কাজ করবে। তার ভাবভঙ্গি যেন কিছুই হয় নি। সব স্বাভাবিক। তিনি আনন্দিত গলায় বললেন, হিমুর জন্য একটা ঘর রাখবে। ও যখন ইচ্ছে তখন এখানে থাকবে। হিমুর ঘরের রঙ হবে হলুদ।

খালু সাহেবের পছন্দের রঙ কী?

মাজেদা খালা চোখ-মুখ শক্ত করে বললেন, তার ঘর এমন করে বানাবে যেন আলো-হাওয়ার বংশ না ঢুকে। চিপা বাথরুম রাখবে। বাথরুম এমনভাবে

বানাবে যেন বাথরুমে সামান্য পানি জমলেই সেই পানি চুইয়ে লোকটার ঘরে ঢুকে যায়। পারবে না?

অবশ্যই পারব। আপনি চাইলে রান্নাঘর এমন ডিজাইন করব যেন রান্নাঘরের ধোঁয়াও উনার ঘরে ঢোকে। কাশতে কাশতে জীবন যাবে।

ভালো তো। খুব ভালো। চা খাবে? আসো চা খাই।

আমি চা খেয়ে চলে গেলাম জহির স্যারের কোচিং সেন্টারে। অতি দুষ্ট এই মানুষটার মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে আমার রক্তে আগুন ধরে যায়। আগুন ধরার এই ব্যাপারটা আমি পছন্দ করি।

জহির স্যারের কাছে আজ আমি বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে যাচ্ছি। তার সঙ্গে হিমুর মতো কিছুক্ষণ কথা বলে তাকে বিভ্রান্ত করব। জহির স্যারকে কী বলব তাও আমি গুছিয়ে রেখেছি। তবে গুছিয়ে রাখা কথা সব সময় বলা হয় না। এক কথা থেকে অন্য কথা চলে আসে। দেখা যাক কী হয়। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

জহির স্যার আমাকে দেখে খুশি খুশি গলায় বললেন, তোমার জন্য অসম্ভব ভালো খবর আছে।

আমি বললাম, কী খবর স্যার?

গ্রামের পুকুরের মানুষের মুখের মতো দেখতে মাছটা সবাই ভেবেছে মারা গেছে। দেখা যেত না। গতকাল দেখা গেছে।

বলেন কী!

এই উইকএন্ডে যাবে? এরপর আমি খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ব। কোচিং সেন্টারে টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে। ঠিক আছে?

অবশ্যই ঠিক আছে। আপনার বন্ধু যাবেন না? পরিমল সাহেব।

বলে দেখব। যেতেও পারে। বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় রওনা হব। তোমাকে কোত্থেকে তুলব?

পীর বাচ্চাবাবার মাজার থেকে তুলে নেবেন। আমি ওইখানে রেডি হয়ে থাকব।

পীর বাচ্চাবাবার মাজার মানে?

আমার পরিচিত একজন ওই মাজারের অ্যাসিসটেন্ট খাদেম। তার নাম হিমু। ঢাকা শহরের সবচেয়ে গরম মাজার।

মাজারের আবার ঠান্ডা-গরম কী?

ঠান্ডা-গরম আছে স্যার। হার্ভার্ডের ফিজিক্স-এর একজন পিএইচডি সোনারগাঁ হোটেলের চার শ' সাত নাম্বার রুমে উঠেছিলেন। কী মনে করে একদিন মাজার দেখতে গিয়েছিলেন, তারপর আটকা পড়লেন।

আটকা পড়লেন মানে কী?

এখন তিনি মাজারে থাকেন। মাজারেই ঘুমান। এশার নামাজের পর হুজুরের সঙ্গে জিগির করেন।

অ্যাবসার্ড কথাবার্তা বলছ।

অনেক বড় বড় লোকজন সেখানে যান, মন্ত্রী-মিনিস্টারেরা গোপনে যান, গোপনে চলে আসেন। বৃহস্পতিবারে আপনি তো আমাকে তুলতে যাচ্ছেন, নিজেই দেখবেন।

তুমি কি নিয়মিত মাজারে যাও?

জি-না স্যার। আমার মাজারভক্তি নাই। এই মাজারের ডিজাইন করার দায়িত্ব আমার উপর পড়েছে। অল্প জায়গা তো, ডিজাইন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছি। আমি ঠিক করেছি উপরের দিকে উঠে যাব। স্পাইরেল ডিজাইন হবে। ফিবোনাচ্চি রাশিমালা ব্যবহার করব। কয়েক কোটি টাকার প্রজেক্ট।

কোটি টাকা কে দিচ্ছে?

উনার নাম গোপন। কাউকে জানাতে চাচ্ছেন না।

জহির স্যারকে খানিকটা হকচকিয়ে বের হয়ে এলাম। এখন কী করব বুঝতে পারছি না।

হিমুর মতো হাঁটব? আমার সমস্যা কী হয়েছে বুঝতে পারছি না। মাজারের একটা ডিজাইন সত্যি সত্যি আমার মাথায় এসেছে। ফিবোনাচ্চি সিরিজের চিন্তাটাও আছে। ১-১-২-৩-৫-৮,... প্রতিটি সংখ্যা আগের দুটি সংখ্যার যোগফল।

পুরো স্ট্রাকচার হবে কংক্রিটের। উপরটা হবে ফাঁকা। রোদ আসবে বৃষ্টি আসবে। স্ট্রাকচারের রঙ হবে হলুদ।

আচ্ছা আমার মাথায় হলুদ ঘুরছে কেন? আজ যে শাড়িটা পরেছি, তার রঙও হলুদ। ইচ্ছা করে হলুদ পরি নি। হাতে উঠেছে পরে ফেলেছি। কোনো মানে হয়? Something is wrong, Something is very wrong.

৭

বল্টু স্যার পীর বাচ্চাবাবার মাজারে পড়ে আছেন। ঝামেলামুক্ত মানুষকে যেমন দেখায় তাঁকে সেরকম দেখাচ্ছে। এখানে তিনি ঘুমের মধ্যে ইলেকট্রন, প্রোটন বা পজিট্রন হচ্ছেন না। তাঁকে ঘুরপাক খেতে হচ্ছে না। রাতে শান্তিময় ঘুম হচ্ছে। মাঝে মাঝে তাঁকে মাথা দুলিয়ে 'London breeze is falling down' বলতে দেখা যাচ্ছে। বাচ্চাদের এই রাইম কেন তাঁর মাথায় ঢুকেছে তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে হুজুর খুশি। হুজুরের ধারণা বল্টু স্যার জিগিরের মধ্যে আছেন। মাজারে তাঁর গোসলের সমস্যা ছিল, আমি তাঁকে 'গোসলের সুব্যবস্থা আছে।...মহিলা নিষেধ' লেখা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গোসল করিয়ে এনেছি। গোসল করে তিনি মোটামুটি তৃপ্ত। তাঁকে দুই বালতি পানি দেওয়া হয়েছিল। এক বালতি গরম পানি, এক বালতি ঠান্ডা। একটা মিনিপ্যাক শ্যাম্পু এবং এক টুকরা সাবান।

গোসলখানা থেকে বের হয়ে তিনি মুগ্ধ গলায় বলেছেন, বাংলাদেশ দ্রুত উন্নতি করছে। টার্কিশ বাথের স্টাইলে স্নানের ব্যবস্থা করছে। পথেঘাটে যারা চলাফেরা করে তাদের স্নানের প্রয়োজন। এরা এই প্রয়োজন মেটাচ্ছে। আমি নিশ্চিত বাংলাদেশ দ্রুত মধ্য-আয়ের দেশ হয়ে যাবে।

বাঁদরের দোকান দেখেও বল্টু স্যার অভিভূত হলেন। চোখ বড় বড় করে বললেন, বাঁদরের দোকান না-কি?

আমি বললাম, স্যার বাঁদরের দোকান বলেই মনে হয়, তবে এরা বাঁদর বিক্রি করে না।

বাঁদর বিক্রি করে না তা হলে এতগুলো বাঁদর নিয়ে দোকান সাজিয়েছে কেন?

জানি না স্যার।

জানবে না? জানার ইচ্ছা কেন হবে না? কৌতূহলের অভাব মানেই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মৃত্যু। গ্যালিলিও যদি কৌতূহলী হয়ে আকাশের দিকে দুরবিন তাক না করতেন তা হলে আমরা এক শ' বছর পিছিয়ে থাকতাম।

আমি বললাম, বাঁদরের বিষয়ে অনুসন্ধান না করলে আমরা কতদিন পিছাব?

স্যার আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নিজেই অনুসন্ধানে গেলেন। যা জানা গেল তা হলো এরা হচ্ছে 'ট্রেনিং বান্দর'। ওস্তাদ এদের ট্রেনিং দেন। ট্রেনিং-এর শেষে যারা বাঁদর নিয়ে খেলা দেখায়, তারা কিনে নিয়ে যায়। তখন দাম জোড়া দশ হাজার টাকা। সিঙ্গেল বিক্রি হয় না। ট্রেনিং-এর খরচ আলাদা।

বল্টু স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দশ হাজার টাকায় দুটা ট্রেইনড মাংকি পাওয়া যাচ্ছে। প্রাইস আমার কাছে

প্রবন্ধ ভ্রমণ ঈদ সাক্ষাৎকার গল্প কবিতা বিশেষ রচনা বড় গল্প উপন্যাস কিশোর উপন্যাস নিসর্গ বিশেষ ফিচার রম্য স্বাস্থ্য নিবন্ধ

রিজনেবল মনে হচ্ছে। পার পিস পঞ্চাশ ডলারের সামান্য বেশি পড়ছে।

আমি বললাম, কিনবেন নাকি স্যার?

এখনো বুঝতে পারছি না। আমার কাছে যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। ট্রেনিং-এর পর এরা কী কী খেলা দেখাবে?

দোকানের মালিক তক্ষক-চোখা বলল, তিন আইটেমের খেলা পাবেন। স্বামী-স্ত্রীর শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, স্বামী-স্ত্রীর মিল মহব্বত। তিনটাই হিট আইটেম।

স্যার চকচকে চোখে বললেন, ইন্টারেস্টিং! আমেরিকায় ট্রেইনড পশুপাখির অসম্ভব কদর। হলিউডে ট্রেইনড পশুপাখির একটা শো দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমরাও যে পিছিয়ে নেই এটা জেনে আনন্দ পাচ্ছি।

দোকানি বলল, স্যার নিয়া যান। খেলা দেখায়ে দৈনিক তিন-চার শ' টাকা আয় করতে পারবেন।

স্যার আমার দিকে সমর্থনের আশায় তাকালেন। অতি মেধাবীরা তারছেঁড়া মানুষ হয়। দুই বাঁদর নিয়ে উনি কী করবেন কিছুই ভাবছেন না। এই মুহূর্তে তাঁর বিষয়টা মনে ধরেছে। তারছেঁড়া মানুষের জন্য মুহূর্তের বাসনার মূল্য অসীম।

আমি বললাম, এখনই কিনে ফেলতে হবে তা-না। স্যার, আপনি চিন্তাভাবনা করুন। এদের রাখাও তো সমস্যা। ফাইভ স্টার হোটেল নিশ্চয় বাঁদর রাখতে দিবে না।

দোকানি উদাস গলায় বলল, কার্ড নিয়া যান। চিন্তাভাবনা করেন। যদি মনে করেন কিনবেন মোবাইল করবেন। মাল ডেলিভারি দিয়া আসব। দাম নিয়া মুলামুলি চলবে না।

স্যারকে নিয়ে ফিরছি। তাঁর হাতে বাঁদরের দোকানের ভিজিটিং কার্ড। স্যারের চেহারা একটু মলিন। ঘানি ভাঙানো তেলের দোকানে এসে আবার তাঁর চোখ উজ্জ্বল হলো। তিনি আগ্রহ নিয়ে বললেন, সবাই বোতল হাতে নিয়ে বসে আছে কেন?

আমি ব্যাখ্যা করলাম।

স্যার বললেন, এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগে মেশিনে তেল না ভাঙিয়ে ঘোড়া দিয়ে কেন ভাঙাচ্ছে?

আমি বললাম, ঘোড়াদের মুখের দিকে তাকিয়েই এটা করা হচ্ছে। ঘোড়াদের এখন কোনো কাজ নেই। এরা বেকার। কেউ ঘোড়ায় চড়ে শ্বশুরবাড়ি যায় না। ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করার রেওয়াজও উঠে গেছে। এই কারণেই এদের আমরা ঘানিতে লাগিয়ে ঘোরাচ্ছি।

স্যার বললেন, ভেরি স্যাড!

তিনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই আটকে যাচ্ছেন। তাঁকে নড়ানো যাচ্ছে না। ঘানির দোকানের সামনেও তিনি আটকে গেলেন। আমি বললাম, স্যার এক ছটাক খাঁটি সরিষার তেল কি আপনার জন্য কিনব?

স্যার বললেন, এক ছটাক তেল দিয়ে আমি কী করব?

বাংলাদেশে খাঁটি সরিষার তেল নাকে দিয়ে ঘুমানোর সিস্টেম আছে স্যার। ঘুম খুব ভালো হয়।

কেন?

নাকের এয়ার প্যাসেজ ক্লিয়ার থাকে। সরিষার ঝাঁঝও হয়তো কাজ করে।

স্যার বললেন, ইন্টারেস্টিং।

আমি তাঁর জন্য এক ছটাক তেল কিনে মাজারে ফিরে এলাম। তার দু'ঘণ্টা পর আমাদের সঙ্গে খালু সাহেব যুক্ত হলেন। মাজেদা খালার তাড়া খেয়ে তিনি কিছুটা বিপর্যস্ত। আমাকে বললেন, হিমু! বেঁচে থাকার বিষয়ে কোনো আগ্রহ বোধ করছি না। তোমার মাজেদা খালা আমাকে বলেছে, Go to hell.

আমি বললাম, এখানকার ঠিকানা কোথায় পেয়েছেন?

খালু ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, এখানকার ঠিকানা কোথায় পেলাম এটা ইম্পরটেন্ট, নাকি তোমার খালা যে বলল, গো টু হেল সেটা ইম্পরটেন্ট?

খালার কথাই ইম্পরটেন্ট।

আমি ঠিক করেছি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কারও বাড়িতে গিয়ে উঠব না। কারও করুণা ভিক্ষা করব না। পথেঘাটে থাকব।

সোনারগাঁ হোটেলের একটা রুম আমাদের নেওয়া আছে। রুমটা ডক্টর চৌধুরী আখলাকুর রহমান ওরফে বল্টু স্যারের। সেখানে উঠবেন? রুম খালি আছে।

সে গেছে কোথায়?

ওই যে কোনায় মশারি খাটিয়ে ঘুমাচ্ছেন। তাঁর নাকে দু'ফোঁটা খাঁটি সরিষার তেল দেওয়া হয়েছে। নেসাল প্যাসেজ ক্লিয়ার থাকায় ভালো ঘুম হচ্ছে।

সে এখানে বাস করে নাকি?

জি। হোটেলে ঘুমালেই তিনি ইলেকট্রন-প্রোটন হয়ে যাচ্ছেন, এইজন্যে এখানে থাকেন।

খালু মশারি তুলে উঁকি দিয়ে বললেন, আসলেই তো সে! মাথা পুরো মনে হয় কলাপস করেছে। তার ভাই নাটের মতো অবস্থা। নাট লালমাটিয়া কলেজে জিওগ্রাফি পড়াত। হঠাৎ একদিন বলে কী, কাক হলো মানবসভ্যতার মাপকাঠি। কাকের সংখ্যা গোনা দরকার।

তারপর উনি কি কাক গোনা শুরু করলেন?

বাকি খবর রাখি না। আমার রাখার প্রয়োজন কী? তার নিজের ভাই বল্টু কোনো খবর রাখে? সে তো নাকে সরিষার তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আমেরিকান ইউনিভার্সিটির এত বড় প্রফেসরশিপ ছেড়ে চলে এসেছে। এখন এক মাজারের চিপায় শুয়ে আছে। পদ্মার পাড়ে তাদের বিশাল দোতলা বাড়ি। সেই বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। দুই ভাইয়ের কেউই নেই। একজন মাজারে শুয়ে আছে আরেকজন কাকশুমারি করছে। দুজনকেই থাপড়ানো দরকার।

হুজুর মনে হয় আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। তিনি খালু সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, জনাব আপনার মন মিজাজ মনে হয় অত্যাধিক খারাপ।

খালু সাহেব জবাব দিলেন না। হুজুর বললেন, একমনে জিগির করেন, মন শান্ত হবে।

কী করব?

জিগির। আপনার কানে কানে আল্লাহপাকের একটা জাতনাম বলে দিব। দমে দমে জিগির করবেন। প্রতি দমের জন্য সোয়াব পাবেন।

খালু সাহেব বললেন, স্টুপিড!

হুজুর বললেন, অত্যাধিক খাঁটি কথা বলেছেন। আমি মূর্খ। ইহা সত্য। আমি একা না। আমরা সবাই মূর্খ। শুধু আল্লাহপাক জ্ঞানী। উনার এক নাম আল আলীমু। এর অর্থ মহাজ্ঞানী। এই নাম জালালী গুণ সম্পন্ন। উনার আরেক নাম আল মুহছিউ। এর অর্থ সর্বজ্ঞানী। এই নামও জালালী। উনার কিছু নাম আছে জামালী, যেমন আর রাযযাকু। এর অর্থ মহান অন্নদাতা।

খালু সাহেব একবার আমার দিকে তাকাচ্ছেন আরেকবার হুজুরের দিকে তাকাচ্ছেন। মাথায় জট পাকানো অবস্থায় খালু এসেছেন। সময় যতই যাচ্ছে জট না খুলে আরও পাকিয়ে যাচ্ছে।



বল্টু স্যারের সঙ্গে খালু সাহেবের দীর্ঘ বৈঠক হলো। খালু এক নাগাড়ে কথা বলে গেলেন, বল্টু স্যার শুনে গেলেন।

খালু সাহেব বললেন, তোমাদের 'জীনে' কিছু সমস্যা আছে। তোমার এক ভাই কাক গুনে বেড়াচ্ছে আর তুমি মাজারে

শুয়ে ঘুমাচ্ছ। শুনলাম নাকে সরিষার তেলও দিয়েছ।

স্যার বললেন, এক ফোঁটা করে দিয়েছি। এতে সুনিদ্রা হয়েছে।

আমি জানতাম না যে, তুমি প্রফেসরশিপ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছ। কয়েকদিন আগে জেনেছি। চাকরি ছাড়ার কারণটা কী ?

স্যার বললেন, স্ট্রিং-এর সমস্যা।

খালু সাহেব বললেন, স্ট্রিং-এর সমস্যা মানে কী ?

এই জগৎ শেষটায় থেমেছে String থিওরিতে। এই থিওরি বলছে, মহাবিশ্বে যা আছে সবই কম্পন। স্ট্রিংয়ের মতো কম্পন।

কম্পন ?

জি কম্পন। সুপার স্ট্রিং থিওরিটা কি ব্যাখ্যা করব ? পাঁচ ডাইমেনশন, একটু জটিল মনে হতে পারে।

না।

আমি, আপনি, চন্দ্র, সূর্য সবই কম্পনের প্রকাশ।

কিসের প্রকাশ ?

কম্পনের।

খালু সাহেব বললেন, তোমার মাথায় তো দমকল দিয়ে পানি ঢালা দরকার। সবকিছু মাথা থেকে দূর করো। বিয়ে করো। এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করো যার মাথা ঠিক আছে। বুঝেছ ?

জি।

তাকে নিয়ে তোমার গ্রামের বাড়িতে সংসার পাতো।

জি আচ্ছা।

নাট-কে খুঁজে বের করো। নাট বল্টু একসঙ্গে থাকো।

হুজুর খালু সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি উনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না। উনি মাসুক অবস্থায় আছেন।

খালু সাহেব বললেন, মাসুক অবস্থাটা

কী ?

হুজুর বললেন, আল্লাহর পথে যে দেওয়ানা হয় সে মাসুক। যেমন লাইলী মজনু।

খালু সাহেব কঠিন গলায় বললেন, আমি তো যতদূর জানি মজনু লাইলীর প্রেমে দেওয়ানা হয়েছিল।

হুজুর বললেন, মূলে আল্লাহপাকের প্রেমে মাসুক। মাজারে কিছুদিন থাকেন। জিগির করেন বা না-করেন আপনার মধ্যেও মাসুকভাব হবে।

খালু সাহেব গোল গোল চোখ করে তাকিয়ে রইলেন।

তাঁকে খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে। তাঁর স্প্রিংয়ের কম্পন বেশি হচ্ছে। সেই তুলনায় বল্টু স্যার শান্ত। খালু সাহেবকে গোসল করিয়ে আনব কি না বুঝতে পারছি না। রেস্টুরেন্ট থেকে সিঙ্গেল শাম্পু দিয়ে গোসল করে আনানোর ফল শুভ হতে পারে। ফেরার পথে বাঁদরের খেলা দেখিয়ে আনা যেতে পারে। বাঁদর দেখা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো।

খালু সাহেব বল্টু স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন, মাথা থেকে Physics দূর করে দাও। অন্য কিছু নিয়ে ভাবো। ডিরেকশন চেঞ্জ করো। Physics যদি হয় উত্তর তা হলে চলে যাও দক্ষিণে। পদার্থবিদ্যার 'অপজিট' কী হবে ?

বল্টু স্যার বললেন, ভূত-প্রেত হতে পারে।

খালু সাহেব বললেন, ভূত-প্রেত খারাপ কী ? ওই নিয়ে চিন্তা করো। প্রয়োজনে বই লিখে ফেলো। ফিজিক্সের উপর তোমার লেখা কী বই নাকি আছে ? New York Times-এর Best Seller। নাম কি বইটার ?

ফিজিক্সের বই না। ম্যাথমেটিক্স—The Book of Infinity.

আমি বললাম, 'বাংলার ভূত' এই নামে স্যারের একটা বই লেখার পরিকল্পনা আছে। গবেষণাধর্মী বই। ভূতদের পরিচিতি থাকবে। তাদের কর্মকাণ্ড থাকবে।

খালু সাহেব অবাক হয়ে বললেন, সত্যি কি এরকম কিছু লিখছ নাকি ?

বল্টু স্যার বললেন, ট্র্যাক বদলের জন্যে লেখা যেতে পারে। কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা।

খালু সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। হুজুর তখন বললেন, সব সমস্যার সমাধান জিগির। দমে দমে সোয়াব।

আজ বৃহস্পতিবার। আবহাওয়া ব্যাঙদের জন্যে উত্তম। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। বল্টু স্যারকে A4 সাইজের কাগজ কিনে দিয়েছি, তিনি 'বাংলার ভূত' গ্রন্থ লেখা শুরু করেছেন। ইংরেজিতে লেখা হচ্ছে। অনুবাদ করে বাংলা একাডেমীতে জমা দেওয়া হবে। মূল ইংরেজিটি Penguin-ওয়ালাদের গছানোর চেষ্টা করা হবে।

বাংলার ভূতের শুরুটা এ রকম—

> "Because the ghosts are not there" might be reason enough to write a book about ghosts. But fortunately, there are better reasons than that.
>
> Ghosts in its various guises, has been a subject of endvring faciantion for millennia...

বই লেখা শুরু হয়েছে এই সুসংবাদটা বাংলা একাডেমীর ডিজি সাহেবকে দেওয়ার জন্যে টেলিফোন করেছিলাম। তিনি মনে হয় খুবই বিরক্ত হয়েছেন।

আপনি হিমু ? সেই হিমু যে অসময়ে টেলিফোন করে আমাকে বিরক্ত করে ?

জি স্যার। একটা সুসংবাদ দেওয়ার জন্যে টেলিফোন করেছি। বই লেখা শুরু হয়ে গেছে স্যার।

কী বই লেখা শুরু হয়েছে ?

'বাংলার ভূত' নামের বইটা। ইংরেজিতে লেখা হচ্ছে, আপনাদের কষ্ট করে বাংলায় অনুবাদ করে নিতে হবে।

ডিজি সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। আমি বললাম, ইংরেজি ভার্সানটা আমরা পেঙ্গুইন থেকে বের করতে চাচ্ছি। স্যার, ওদের কোনো নাম্বার কি আপনার কাছে আছে ?

সরি, না।

বইটার ইংরেজি ভার্সান যদি পড়তে চান চলে আসবেন। আমার ঠিকানাটা কি দেব ?

ডিজি সাহেব কঠিন গলায় বললেন, হ্যাঁ ঠিকানা লাগবে। আমি আসব। আমি অবশ্যই আসব। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

খালু সাহেব রাগকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ বাড়িতে ঢুকতে গিয়েছিলেন। অনেকবার বেল টেপার পরও মাজেদা খালা দরজা খুলেন নি। দরজার ফাঁক দিয়ে বললেন, Go to hell.

খালু সাহেব মিনমিন করে বললেন, যা হওয়ার হয়েছে। বাদ দাও। আমি নিজের বিছানা ছাড়া সারা রাত এক মাজারে না ঘুমিয়ে বসে ছিলাম।

মাজেদা খালা বললেন, শুনে খুশি হয়েছি। এখন আবার মাজারে চলে যাও। আমি তুতুরিকে দিয়ে বাড়িঘর ভাংচুর করে ঠিক করব, তখন এসো বিবেচনা করব।

খালু সাহেব ফিরে এসেছেন। নিমগাছের নিচে বসে আছেন। তাঁর চেহারায় তীব্র বৈরাগ্য প্রকাশিত হয়েছে। যে-কোনো মুহূর্তে নিমগাছ ছেড়ে হাঁটা শুরু করতে পারেন।

হুজুর আনন্দে আছেন। তাঁর মাথার উপর সিলিং ফ্যান ঘুরছে। বল্টু স্যার সিলিং ফ্যান কিনে দিয়েছেন। হুজুর আমাকে ডেকে কানে কানে বলেছেন, তোমার এই স্যার মাসুক আদমি। উনার জন্যে খাসদিলে দোয়া করতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় জ্বিন দিয়ে দোয়া করালে। আগামী শনিবার বাদ এশা জ্বিনের মাধ্যমে দোয়া করাব।

আমি বললাম, ইনশাল্লাহ।

তোমার খালুকে বলো আমি একটা তাবিজ লিখে দিব। এই তাবিজ গলায় পরে স্ত্রী বা হাকিমের সামনে উপস্থিত হলে তাদের দিল নরম হয়।

সকাল দশটার দিকে চোখে সানগ্লাস পরা একজন এসে আমাকে বলল, এক্সকিউজ মি! আমি একটি মেয়ের খোঁজ করছি। তার নাম তুতুরি। সে আমার ছাত্রী। তার আমার সঙ্গে যাওয়ার কথা।

আমি বললাম, তুতুরি এখনো আসে নি। নিশ্চয়ই চলে আসবে। আপনি হুজুরের সঙ্গে বসুন। ফ্যান আছে, আরাম পাবেন।

তুতুরির যে নাম্বার আমার কাছে আছে, সেটা ধরছে না। আপনার কাছে তার অন্য কোনো নাম্বার কি আছে ?

জি-না। আপনি হুজুরের ঘরে বসুন। এত অস্থির হবেন না। আপনি আসল জায়গায় চলে এসেছেন। এই জায়গা থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে না। আপনিও তুতুরি ছাড়া ফিরবেন না। জনাব, আপনার নামটা বলুন।

জহির।

জহির সন্দেহজনক দৃষ্টিতে মাজারের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি বললেন, কার মাজার ?

পীর বাচ্চাবাবার মাজার। তবে আমার ধারণা ঘটনা অন্য।

কী ঘটনা ?

আমি গলা নামিয়ে বললাম, মাজারের প্রধান খাদেমকে দেখছেন না ? উনার দুই পা কাটা পড়েছিল। আমার ধারণা কাটা

দুই পা কবর দিয়ে তিনি মাজার সাজিয়ে বসেছেন।

জহির বললেন, মাজারের সাইজ অবশ্যি খুবই ছোট। টাউটে দেশ ভর্তি হয়ে গেছে। কাটা পায়ের উপর মাজার তুলে ফেলা বিচিত্র কিছু না। এদের ক্রসফায়ারে দেওয়া উচিত।

আমি বললাম, আমাদের হুজুরের অবশ্য কেরামতিও আছে।

কী কেরামতি ?

উনার যেখানে পায়ের আঙুল থাকার কথা সেখানে টান দিলে আঙুল ফুটে।

জহির বললেন, এই সব বুলশীট আমাকে শুনিয়ে লাভ নেই। আপনি কে ?

আমি খাদেমের প্রধান খাদেম। আমার কাজ উনার পা টিপা। পায়ের যেখানে আঙুল ছিল সেই আঙুল ফুটানো।

উদ্ভট কথাবার্তা আমার সঙ্গে বলবেন না। আমি শিশি খাওয়া পাবলিক না।

আমি বললাম, জগতটাই উদ্ভট। হার্ভার্ডের ফিজিক্সের পিএইচডি বলেছেন, আমরা কিছু না। আমরা সবাই স্ট্রিং-এর কম্পন।

জহির বললেন, ননসেন্স কথাবার্তা বন্ধ রাখুন।

আমি বললাম, জি আচ্ছা। বন্ধ।

জহির ঘড়ি দেখে বিড়বিড় করে বললেন, দেরি করছে কেন বুঝলাম না।

আমি বললাম, পটাসিয়াম সায়ানাইড জোগাড় করতে মনে হয় দেরি হচ্ছে।

পটাসিয়াম সায়ানাইড ?

জি। খাওয়ামাত্র সব শেষ।

কে খাবে ?

আপনি খাবেন। আর আপনার বন্ধু খাবেন। আপনাদের দুজনকে খাওয়ানোর জন্যেই তুতুরি এই জিনিস জোগাড় করছে। কেমিস্ট্রির এক টিচার তুতুরির বান্ধবী। তিনি একগ্লাস পটাসিয়াম সায়ানাইড দিতে রাজি হয়েছেন।

জহিরের মাথা নিশ্চয়ই চক্কর দিয়ে উঠল। তিনি মাজারের রেলিং ধরে চক্কর সামলালেন।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। পটাসিয়াম সায়ানাইডে মৃত্যু অতি দ্রুত হয়। কিছু বুঝবার আগেই শেষ। বমি, খিচুনি, ছটফটানি কিছুই হবে না। টেরও পাবেন না। হাসিমুখে যদি খান, মৃত্যুর পরেও হাসিমুখ থাকবে। মুখের হাসি মুছে যাবে না।

জহির মাজারের রেলিং ধরে তাকিয়ে আছেন। তার কপালে ঘাম। দেখেই বোঝা যাচ্ছে পটাসিয়াম সায়ানাইড ঘটিত প্রবল ধাক্কায় তার স্বাভাবিক মানসিক প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে। এই অবস্থায় সাজেশন ভয়ংকর কার্যকরী হয়। আমি যদি বলি, জহির ভাই! আপনি দুষ্টপ্রকৃতির লোক। অতি দুষ্ট। অতি দুষ্টরা এই মাজার ধরলে সমস্যা আছে। তারা আটকা পড়ে যাবে। হাত ছুটিয়ে নিতে পারবে না।—এই সাজেশন জহিরের মস্তিষ্ক গ্রহণ করবে। মস্তিষ্ক থেকে হাতে কোনো সিগনাল পৌঁছাবে না। অতি দ্রুত হাত ও পায়ের মাসল শক্ত হয়ে যাবে।

বিশেষ এই সাজেশন দেওয়ার আগে আরও হকচকিয়ে দেওয়া দরকার। আমি সহজ গলায় বললাম, আপনি নিশ্চয়ই মাইক্রোবাস নিয়ে এসেছেন। আপনার বন্ধু কোথায় ? মাইক্রোবাসে ? সে এলে ভালো হতো, দুজন হুজুরের কাছে তওবা করে নিতে পারতেন। মৃত্যুর আগে তওবা জরুরি।

জহির চাপা আওয়াজ করলেন। আমি বললাম, জহির ভাই, বিরাট সমস্যা হয়ে গেল। অতি দুষ্ট কেউ মাজারের রেলিং ধরলে আটকে যায়। অতীতে কয়েকবার এরকম ঘটনা ঘটেছে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি আটকে গেছেন। হাজার চেষ্টা করেও হাত ছুটাতে পারবেন না। যত চেষ্টা করেন হাত তত আটকাবে। আমার অনুরোধ অস্থির হবেন না।

অটো সাজেশন কাজ করেছে। জহিরের পকেটে মোবাইল ফোন বাজছে। তিনি টেলিফোন ধরছেন না। মাজারের রেলিং থেকে হাত উঠাচ্ছেন না। তার মুখের মাসল শক্ত হয়ে উঠছে।

অনেকক্ষণ আপনি আপনি করে জহির প্রসঙ্গ বলা হলো, এখন তুমি করে বলা যাক। সবচেয়ে ভালো হতো জাপানিদের মতো সর্বনিম্ন তুই করে বললে। দুঃখের বিষয় বাংলা ভাষায় তুই এর নিচে কিছু নেই। বাংলা একাডেমীর ডিজি সাহেবের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করতে হবে। আপাতত জহিরকে তুমি সম্বোধন করেই চালাই।

জহির খুকখুক করে কাশছে। নাক টানছে। শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলছে। তার চাপা এবং কাতর গলা শোনা গেল, ভাই একটু সাহায্য করেন।

আমি বললাম, অবশ্যই সাহায্য করব। ভূপেন হাজারিকা বলে গেছেন, মানুষ মানুষের জন্য। কী সাহায্য চান ?

পানি খাব।

জহির ভাই, পানি খাওয়া ঠিক হবে না। পানি খেলেই প্রস্রাবের বেগ হবে। মাজারে প্রস্রাব করা ঠিক হবে না। পীর বাচ্চাবাবা রাগ করতে পারেন। সিগারেট ধরিয়ে মুখে দিব ?

ধূমপান করি না। আমাকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করেন।

জহির ভাই! অস্থির হবেন না। মাথা ঠান্ডা রাখেন। বিপদে মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়। ভাবি চলে এলে আপনার অস্থিরতা কমবে। উনাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি।

ভাবিটা কে ?

আপনার স্ত্রীর কথা বলছি।

জহির ভাই বললেন, বদমাইশ! মেরে তোর হাড্ডি গুঁড়া করে দেব।

তিন ঘণ্টা পার হয়েছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি জহির রেলিংয়ে আটকে আছে। হুজুর একটু পর পর বলছেন, সোবাহানাল্লাহ! আল্লাহপাকের এ-কী কেরামতি।

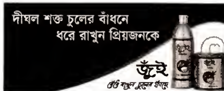
জহিরের বন্ধু পরিমল এসেছিল। সে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দেখল। জহির কাতর গলায় বলল, কোমর ধরে টান দাও। দেখার কিছু নাই।

পরিমল বলল, হয়েছে। তোমার কোমরে ধরলে আমিও আটকে যাব। বলেই দাঁড়াল না, অতি দ্রুত স্থান ত্যাগ করল।

এর মধ্যে মাজারের কেরামতি আশপাশের লোকজনের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই এসে দেখছে মাজারে মানুষ আটকে আছে। 'দৈনিক সাতসকাল' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার এসে গেছে। রিপোর্টারের ধারণা ইচ্ছা করে কেউ একজন রেলিংয়ে আটকে থাকার ভান করছে যেন মাজারের নাম ফাটে। এই রিপোর্টার হুজুরের কাছে গোপনে দশ হাজার টাকা চেয়েছে। টাকা পেলে পজেটিভ রিপোর্ট করা হবে, না পেলে নেগেটিভ রিপোর্ট। এমন রিপোর্ট যে ফ্রডবাজির দায়ে হুজুরকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে।

হুজুর বললেন, আপনার যা রিপোর্ট করার করবেন। আমার হাতে কিছুই নাই, সবই পীর বাচ্চাবাবার হাতে। সোবাহানাল্লাহ্।

সাংবাদিক থাকতে থাকতেই বাংলা একাডেমীর ডিজি সাহেব চলে এলেন। তিনি হতভম্ব। আটকে পড়া মানুষটিকে



দেখে বললেন, আপনার নাম জহির না ? আপনি বাংলা একাডেমীতে একটা পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে টাকা নিয়ে গেছেন। পাণ্ডুলিপির নাম 'বাংলার ঐতিহ্য চেপা শুঁটকির একশত রেসিপি'।

জহির বলল, পাণ্ডুলিপি আমার বন্ধু পরিমলের লেখা। আমি সঙ্গে গিয়েছিলাম।

এখন মাজারে আটকে আছেন ?

জি। স্যার, আমার জন্য একটু দোয়া করেন।

ডিজি স্যার বিড়বিড় করে বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

হুজুর বললেন, বলেন সোবাহানাল্লাহ। এই ধরনের মাজেজা দেখলে সোবাহানাল্লাহ বলা দুরস্ত।

ডিজি স্যার আমাকে দেখেও চিনতে পারলেন না বলে মনে হলো। মাজারে মানুষ আটকা দেখে তার সিস্টেম নষ্ট হয়ে গেছে। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম।

স্যার, আমাকে চিনেছেন ? আমি হিমু। ওই যে ফুতুরি তুতুরি। আপনি হুজুরের ঘরে বসুন। পাণ্ডুলিপি দিয়ে দেই, দশ পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে। নিরিবিলি বসে পড়ুন।

কিসের পাণ্ডুলিপি ?

বাংলার ভূত।

ডিজি স্যার বিড়বিড় করে কী বললেন বুঝলাম না।

আমি বললাম, স্যার কিছু বলেছেন ?

ডিজি স্যার বললেন, একজন ডাক্তার ডেকে আনা উচিত, ডাক্তার দেখুক। একটা লোক মাজারে আটকে আছে, এটা কেমন কথা ?

হুজুর বললেন, জনাব, এই জিনিস মেডিকেলের আন্ডারে না। এটা গায়েবি।

ডিজি স্যার বললেন, আপনি কে ?

হুজুর বললেন, আমি এই মাজারের প্রধান খাদেম। হিমু আমার শিষ্য। জনাব, আপনার পরিচয়টা ?

আমি ডিজি বাংলা একাডেমী।

হুজুর আনন্দিত গলায় বললেন, সোবাহানাল্লাহ। বিশিষ্ট লোকজন আসা শুরু করেছেন। সবই পীর বাচ্চাবাবার কেরামতি।

এত বড় ঘটনা ঘটছে, বল্টু স্যার এবং খালু সাহেব দুজনের কেউ নেই। তারা জোড়া বাঁদর কিনতে গেছেন। জোড়া বাঁদর কেনায় খালু সাহেব কীভাবে যুক্ত হলেন আমি জানি না।

মাজারের সামনে প্রচুর লোক জমে গেছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আপনা আপনি কিছু ভলেন্টিয়ার বের হয়। লাঠি হাতে একজন ভলেন্টিয়ারকে দেখা যাচ্ছে। ভলেন্টিয়ারের পরনে লাল পাঞ্জাবি মাথায় লাল ফেটি। ভলেন্টিয়ার কঠিন গলায় বলছে, লাইন দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে আসেন। ছবি তোলা নিষেধ। মোবাইল বন্ধ করে রাখেন। গরম মাজার! কেউ হাত দিবেন না। হাত দিলে কী অবস্থা নিজের চোখে দেখে যান।

জহিরের শিক্ষাসফর হয়ে গেছে। সে এখন হার্ট অ্যাটাকের সময় যেভাবে ঘামে সেইভাবে ঘামছে। ঘামে শার্ট ভিজে গেছে। প্যান্টও ভিজেছে। তবে এই ভেজা ঘামের ভেজা না, অন্য ভেজা।

তুতুরিকে আসতে দেখা যাচ্ছে। সে ভয়ে ভয়ে এগুচ্ছে। জহির তুতুরিকে দেখে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমাকে বাঁচাও। আমি তোমার পায়ে ধরি, তুমি আমাকে বাঁচাও।

তুতুরি বলল, স্যার আপনার কী সমস্যা ?

জহির বলল, রেলিংয়ে হাত রেখেছি আর ছুটাতে পারছি না।

তুতুরি বলল, আমরা তা হলে আপনার গ্রামের বাড়িতে যাব কীভাবে ?

জহির বলল, রাখো গ্রামের বাড়ি। একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করো। প্লিজ প্লিজ প্লিজ।

তুতুরি

একজন মানুষ নাকি সারা জীবনে সাতবারের বেশি বিস্ময়ে অভিভূত হতে পারে না। এই সাতবারের মধ্যে একবার জন্মের পর পর পৃথিবী দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়। আরেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে। এই দুইবারের স্মৃতি কোনো কাজে আসে না। বাকি থাকে পাঁচ।

এই মাজারে এসে পাঁচের মধ্যে দুটা কাটা গেল। দুবার বিস্ময়ে অভিভূত হলাম।

জহির স্যার মাজারের রেলিং ধরে আটকে আছেন—এটা দেখে প্রথম বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া। এই ঘটনার পেছনে হিমুর নিশ্চয়ই হাত আছে। মাজারের রেলিংয়ে সুপার গ্লু লেগে থাকে না যে হাত দিলেই হাত আটকে যাবে। এরচেয়ে বড় বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। মাজারের প্রধান খাদেম পা কাটা হুজুর সেই বিস্ময়। এই হুজুর আমাকে ট্রাকের নিচে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে এই খবর ছোটবেলায় পেয়েছিলাম। বাবা কয়েকবারই আমাকে হুজুরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। উনি অচেতনের মতো ছিলেন, কোনোবারই ঠিকমতো আমাকে দেখেন নি।

আশ্চর্যের ব্যাপার, হুজুর আমাকে দেখেই বললেন, জয়নাব না ? সোবাহানাল্লাহ। কেমন আছো মা ?

আমি জানি তাঁর পা নেই, তারপরেও আমি কদমবুসি করার জন্যে নিচু হলাম। হুজুর বললেন, পা নাই তাতে কোনো সমস্যা নাই গো মা। তুমি কদমবুসি করো—জিনিস জায়গামতো পৌঁছে যাবে। তোমার পিতামাতা কেমন আছেন ?

তাঁরা দুজনই মারা গেছেন।

আহারে আহারে আহারে। চিন্তা করবা না মা, আল্লাহপাক এক হাতে নেন আরেক হাতে ফেরত দেন। এটাই উনার কাজের ধারা। মা, তুমি কি বিবাহ করেছ ?

জি-না।

এই বিষয়েও চিন্তা করবে না। খাসদিলে দোয়া করে দিব। প্রয়োজনে জ্বিনের মারফত দোয়া করাব। সুবিধা যখন আছে। মা, ফ্যানের নিচে বসো। মাথাটা ঠান্ডা করো। তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেই—ইনি ডিজি বাংলা একাডেমী। বিশিষ্টজন। মাজারের টানে চলে এসেছেন।

আমি ডিজি সাহেবকে সালাম দিলাম। নিজের পরিচয় দিলাম। তিনি কিছুটা অবাক হয়ে বললেন, তুমি একজন আর্কিটেক্ট ?

জি স্যার।

নাম কী ?

ভালো নাম জয়নাব, ডাকনাম তুতুরি।

তুতুরি ?

জি স্যার তুতুরি।

ডিজি স্যার বিড়বিড় করে বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। তুতুরি থেকেই কি ফুতুরি ভুতুরি ?

জি স্যার।

ডিজি স্যার হতাশ গলায় বললেন, আমি তো মনে হয় ভালো চক্করে পড়ে গেছি।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে বাইরে হইচই হতে লাগল। আমি এবং ডিজি স্যার ঘটনা কী দেখার জন্যে বের হলাম।



ঘটনা হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে একজন ডাক্তার এসেছেন। ডাক্তারের সঙ্গে পরিমল। এই বদমায়েশ মনে হয় ডাক্তার নিয়ে এসেছে।

ডাক্তার জহির স্যারকে বললেন, হাতের সব মাসল স্টিফ হয়ে গেছে। আপনি কি পা নাড়াতে পারেন?

জহির স্যার বললেন, পারি। তবে পায়ের তালু গরম হয়েছে। কাউকে বলেন, জুতা-মোজা খুলে দিতে।

হিমু অগ্রহী হয়ে জুতা-মোজা খুলল। জহির স্যার কয়েকবার পা ওঠানামা করলেন। তখন হিমু বলল, জুতা-মোজা খোলা মনে হয় ঠিক হয় নাই। এখন মেঝের সঙ্গে পা আটকে যেতে পারে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, হিমুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জহির স্যার কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললেন, পা আটকে গেছে।

ডাক্তার সাহেব ঘটনা দেখে ঘাবড়ে গেছেন, মাসল রিলাক্সের ইনজেকশন দিয়ে লাভ হবে না। প্রবলেমটা নিওরো। নিওরো মেডিসিনের কাউকে আনতে হবে।

ডিজি স্যার নিচু গলায় আমাকে বললেন, হিমু নামের ওই যুবকের এখানে কিছু ভূমিকা আছে। অতি দুষ্টপ্রকৃতির যুবক। আমাকে নানান ভুজং ভাজং দিয়ে সে এখানে নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। মাজারের খাদেমটাও বদ। সে এই ঘটনায় যুক্ত।

আমি বললাম, স্যার, হিমু বদ না ভালো এই বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারছি না। তবে যিনি খাদেম, তিনি চলন্ত ট্রাকের নিচে পড়া থেকে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। ট্রাকের চাকা তার পায়ের উপর দিয়ে চলে যায়। তার পা কেটে বাদ দিতে হয়।

ডিজি স্যার বললেন, কী বলো তুমি! উনি তো তা হলে সুফি পর্যায়ের মানুষ। উনার সম্পর্কে অতি বাজে ধারণা ছিল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

আমি এবং ডিজি স্যার হুজুরের সামনে বসে আছি। হিমু আমাদের জন্যে চা নিয়ে এসেছে, আমরা চা খাচ্ছি। হিমু নিজে জহির স্যারকে চা খাওয়াচ্ছে। চায়ের কাপ স্যারের মুখে ধরছে, স্যার চুক চুক করে খাচ্ছে।

হুজুর চোখ বন্ধ করে জিগিরে বসেছেন। ডিজি স্যারের হাতে কিছু কাগজ। কাগজগুলো হিমু তাঁকে ধরিয়ে

দিয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, হার্ভার্ডের ফিজিক্সের একজন পিএইচডি ভূত নিয়ে বই লিখছে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

আমি বললাম, একজন মানুষের মাজারের রেলিংয়ে আটকে যাওয়া যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় তা হলে হার্ভার্ডের পিএইচডির ভূতের উপর বই লেখাও বিশ্বাসযোগ্য। আমি উনাকে চিনি। তিনি ম্যাথমেটিক্সের একটি বই লিখেছেন, The Book of Infinity. বইটি New York Times-এর বেস্ট সেলারের তালিকায় আছে। ম্যাকমিলন বুক কোম্পানি বইটির প্রকাশক।

ডিজি স্যার চোখ কপালে তুলে বললেন, বলো কী!

আমি বললাম, আপনি কয়েক পাতা পড়ে দেখুন। হয়তো দেখা যাবে এই বইটিও হবে বেস্ট সেলার।

ডিজি স্যার পড়া শুরু করেছেন। আগ্রহ নিয়ে পড়ছেন।

আমি বাইরে কী হচ্ছে দেখার জন্যে বের হলাম। পরিস্থিতি শান্ত। জনসমাগম বেড়েছে। পুলিশ চলে আসায় শৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। ছেলে এবং মেয়ের জন্যে আলাদা লাইন হয়েছে। জহির স্যারের স্ত্রী চলে এসেছেন। মহিলা মৈনাক পর্বত সাইজের। তিনি খড়খড়ে গলায় বলছেন, তুমি যে কতটা ভয়ঙ্কর মানুষ এটা আমি জানি। এতদিন মুখ খুলি নি। আজ খুলব। তুমি এখানে আটকা পড়েছ, আমি খুশি। সারা জীবন এখানে আটকে থাকো এই আমি চাই।

হিমু মহিলাকে বলল, ম্যাডাম, আপনি উত্তেজিত হবেন না। যেভাবেই হোক আমরা জহির ভাইকে রিলিজ করে আপনার হাতে তুলে দিব। তখন আপনি ব্যবস্থা নিবেন। প্রয়োজনে ডাক্তারের উপস্থিতিতে কব্জি কেটে উনাকে রিলিজ করা হবে। জহির ভাই! রাজি আছেন ?

জহির স্যার গোঙানির মতো শব্দ করলেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি হিমুর দিকে। এই মানুষটা কে ? মাজেদা খালা যেমন বলেছিলেন তেমন কিছু অলৌকিক শক্তিধর কেউ ?

ডিজি স্যার থতমত অবস্থায় আছেন। তিনি লেখা পড়ে শেষ করেছেন। বুঝতে পারছি লেখা তাকে অভিভূত করেছে। তিনি নিজের মনে বললেন, ব্রিলিয়ান্ট! এমন স্বাদু রচনা বহুদিন পাঠ করি নি। এই লেখককে রয়েল স্যালুট দিতে ইচ্ছা করছে। এই বইটির বঙ্গানুবাদ বাংলা একাডেমী থেকে অবশ্যই বের হবে। এতে যদি আমার চাকরি চলে যায় চলে যাবে।

ডিজি স্যারের কথা শেষ হওয়ার আগেই শিকলে বাঁধা দুই বাঁদর নিয়ে বল্টু স্যার এবং মাজেদা খালার হাজবেন্ড ঢুকলেন। বাইরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে তা নিয়ে দুজনের কাউকেই আগ্রহী মনে হলো না। দুজনের সমগ্র চিন্তাচেতনা বাঁদর দম্পতিকে নিয়ে। আমি ডিজি স্যারের সঙ্গে দুজনের পরিচয় করিয়ে দিলাম। এই বিষয়েও তাদের কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। বল্টু স্যার বললেন, শ্বশুরবাড়ি যাত্রা।

মাজেদা খালার স্বামী বললেন, এই আইটেম সবচেয়ে ফালতু। প্রথমে দেখাও স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলন।

দুই বাঁদর স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলন অভিনয় করে দেখাচ্ছে। হুজুর বললেন, সোবাহানাল্লাহ!

ডিজি স্যার একবার বাঁদর দুটিকে দেখছেন, একবার হার্ভার্ড পিএইচডি'র দিকে তাকাচ্ছেন, একবার তার হাতের কাগজের তাড়াতে চোখ বুলাচ্ছেন। একইসঙ্গে মানবজাতির তিনটি আবেগ তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিস্মিত, হতভম্ব এবং স্তম্ভিত।

বাইরে বিরাট হইচই। দুটি টিভি চ্যানেলের লোকজন চলে এসেছে। কালো পোশাকের কিছু র‍্যাবও দেখতে পাচ্ছি। হিমুকে কোথাও দেখছি না। আমি নিশ্চিত হিমু এখানে নেই। সে সবাইকে এখানে জড়ো করেছে। তার কাজ শেষ হয়েছে। মাজেদা খালা বলেছিলেন, হিমু একটা ঘটনা ঘটিয়ে ডুব দেয়। অনেক দিন তার আর খোঁজ পাওয়া যায় না। আবার উদয় হয়, নতুন কিছু ঘটায়। তুতুরি, তুমি এর কাছ থেকে দূরে থাকবে।

ভেতর থেকে হুজুর ডাকলেন, জয়নাব মা। ভেতরে আসো। জরুরি কথা আছে।

আমি ঘরে ঢুকে দেখি, দুই বাঁদরের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা দেখানো হচ্ছে। বল্টু স্যার এবং মাজেদা খালার স্বামী দৃশ্য দেখে হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের উপর ভেঙে পড়ে যাচ্ছেন। শুধু ডিজি স্যার চোখমুখ শক্ত করে আছেন। বাংলা ভাষার মানুষ হয়েও ইংরেজিতে বলছেন, I can't believe it.

আমাকে কাছে ডেকে হুজুর বললেন, বাঁদর-বাঁদরির খেলাটা দেখো। মজা পাবে।

আমি বাঁদর-বাঁদরির খেলা দেখছি, তেমন মজা পাচ্ছি না।

বল্টু স্যার হুজুরের দিকে তাকিয়ে আনন্দময় গলায় বললেন, এই দুই প্রাণীকে আপনি এত পছন্দ করেছেন বলে ভালো লাগছে। এরা আপনার সঙ্গেই থাকবে।

হুজুর বললেন, আল্লাহপাক আমাকে স্ত্রী দেন নাই, পুত্র-কন্যা কিছুই দেন নাই, উল্টা আমার দুটা ঠ্যাং নিয়ে গেছেন। এখন বুঝতে পারছি তিনি আমাকে সবই দিয়েছেন। আমি মূর্খ বলে বুঝতে পারি নাই।

তাঁর চোখ ছলছল করছে। বাঁদর দুটি দেখাচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলনের দৃশ্য।

আমি হিমু

মাজার জমজমাট অবস্থায় রেখে আমি বের হয়ে এসেছি। তুতুরির সঙ্গে একবার দেখা হলে ভালো লাগত। দেখা হয় নি। এও বা মন্দ কী ? আমাদের সবার জগৎ আলাদা। তুতুরি থাকবে তার জগতে, বল্টু স্যার তাঁর জগতে। আমি বাস করব আমার ভুবনে। শুধু পশুদের আলাদা কোনো ভুবন নেই। সেটাও খারাপ না। পশুদের আলাদা ভুবন নেই বলেই তাদের অন্যরকম আনন্দ থাকে।

আমি হাঁটছি, আমার পেছনে পেছনে একটা কুকুর হাঁটছে। আমি আমার মতো চিন্তা করছি। কুকুর চিন্তা করছে তার মতো। আমি কুকুরের চিন্তায় ঢুকতে পারছি না, কুকুর আমার চিন্তায় ঢুকতে পারছে না।

ঝুম বৃষ্টি শুরু হতেই কুকুর দৌড়ে এক গাড়ি-বারান্দায় আশ্রয় নিল। অবাক হয়ে দেখল আমি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে এগুচ্ছি। সে কী মনে করে আবারও আমার পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করল।

রাস্তায় পানি জমেছে। আমি পানি ভেঙে এগুচ্ছি। আমার পেছনে পানিতে ছপছপ শব্দ তুলে আসছে একটা কালো কুকুর। আমি তাকে চিনি না, সেও আমাকে চেনে না। বন্ধুত্ব তখনই গাঢ় হয় যখন কেউ কাউকে চেনে না। ■